

# শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া

(ষাট দশকের অগ্নিগর্ভ দিনগুলি এবং মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময় পরিক্রমণের প্রত্যক্ষ সুযোগ হয়নি এমনসব কোটি কোটি নবীন পাঠক-পাঠিকার প্রতি উৎসর্গীকৃত)

শিকওয়া কবি আল্লামা ইকবালের এক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ভারতবর্ষের আপামর মুসলিম জনসাধারণ পাকিস্তান—এই কবি-দার্শনিককে ভক্তি ও ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ “আল্লামা” উপাধিতে ভূষিত করেন। যদিও শব্দটি নেহায়েতই সম্মানসূচক একটি শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়, তথাপি শিশুকাল থেকেই আমাদের মন-মগজে শব্দটি এমনভাবে সেটে গিয়েছিল যে আল্লামা শব্দটি কানে গেলেই দাড়িবিহীন গোফওয়ালা এক প্রতিভাদীপ্ত মুখ মনের মুকুরে ভেসে উঠতো। বলা বাহুল্য - মুখটি মহাকবি ইকবালের। তবে ইদানীং আল্লামা শব্দটির বাজারদর একেবারে পড়ে গেছে, এমনসব লোক নামের গোড়ায় শব্দটি লাগিয়ে নিয়েছে যে মৌলিক রচনা দূরে থাক - নিম্নমানের চাপাবাজি ছাড়া তাদের ভাভারে আর কোন সঞ্চয় নাই, রাজনৈতিক চালবাজি করে সহজে টু-পাইস কামানো ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য নাই। তা তারা কর“ন, কার গোঁফটি কত দরের সে বিচার করবে জনগণ। কথায়ই তো আছে - “গোঁফের আমি গোঁফের তুমি গোঁফ দিয়ে যায় চেনা”। মাওলানা ইকবালের আল্লামা আর মাওলানা দেলওয়ারের আল্লামা - লিয়াকত আলীর গোঁফ আর ছগীর আলীর গোঁফ - কার গোঁফের ওজন কতটুকু সে বিচার করবে জনগণ। তাই সাহস করে আমিও আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির নাম মহাকবির ভাভার থেকে চুরি করলাম। স্থানকালের প্রেক্ষাপট বিচার করে আশা করি কবির বিদেহী আত্মা আমার প্রতি র“ষ্ট হবেন না।

শিকওয়া শব্দের অর্থ প্রশ্ন, জওয়াবে শিকওয়ার অর্থ প্রশ্নের জবাব। আমার আজকের লেখার বিষয়বস্তু স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে পঁচাত্তর পরবর্তী জটিল রাজনৈতিক অংগনে ঘুরপাক খাওয়া কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর -- শিকওয়া ও তার জবাব।

পঁচাত্তরে বাংলাদেশের ফাউন্ডিং ফাদার ও তার ঘনিষ্ঠ অনুচরদের হত্যার পর সামরিক একনায়কগন যে রাজনীতির সূচনা করেন - তার মূল লক্ষ্য ছিল সুকৌশলে সাধারণ মানুষের মন হতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে ফেলে পাকিস্তান—এই চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্য-অর্জনে তাদেরকে বহু পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, বহু কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। কখনও ধর্ম বেঁচতে হয়েছে, কখনও স্বাধীনতা-উত্তর দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মূলধন করতে হয়েছে। এবং অবধারিতভাবে যে কাজটি তাদেরকে করতে হয়েছে তা হলো যেকোন উপায়ে স্বাধীনতার প্রাণপুর“ষ মুক্তিযুদ্ধের উজ্জীবনমন্“ শেখ মুজিবের চরিত্র হনন। কোন লোককে দৈহিকভাবে হত্যা করলেই কেবল তার প্রভাব চিরতরে মুছে ফেলা যায় না, বরং দেখা যায় যে অনেক সময় মৃত লোকটি জীবিতের চেয়েও শতগুণ শক্তিশালী হয়ে জন-মানসে চেপে বসে। তাকে চিরকালের জন্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন হতে মুছে ফেলতে হলে তার চরিত্রে কলংক লেপন করে ইমেজটিকে ধংস করে ফেলতে হবে। এই থিওরীর বশবর্তী হয়ে পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক শাসকগন এবং তাদের অনুচররা শেখ মুজিবের চরিত্রের উপর অহরহ কলংক লেপন করে যা“ছ, ইতিহাসের সচল চাকাকে পেছনের দিকে টেনে ধরার হাস্যকর প্রচেষ্টা চালা“ছ। এই রাজনৈতিক দুবৃত্তদের এইটুকু কমন সেসও নাই যে ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলে, জোর করে ইতিহাস রচনা করলে হয়তো দু'চারদিনের জন্যে কিছু লোককে বিভ্রান্ত— করা যায় কিন্তু চিরকালীন ইতিহাসের গায় তা

বিন্দুমাত্র আঁচড়ও কাটতে পারে না। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে, সাম্প্রতিকতম প্রমাণ হিসেবে বিবিসি'র শ্রোতা জরিপটির কথা উল্লেখ করা যায়। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের সমস্— প্রেডিকশন ভুল প্রমানিত করে শ্রোতাগণ শেখ মুজিবকেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বরণ করে নিয়েছে, জাতীয়তাবাদী প্রপাগান্ডা মেশিনের তিরিশ বছর যাবৎ অব্যাহত প্রচার কোন কাজেই আসেনি।

বাংলাদেশে ইতিহাস বিকৃতির নব-পর্যায় শুরু হয়েছে দুই হাজার এক সালে, খালেদা-নিজামি জোট যেদিন বাংলাদেশের তখত তাউসে অধিষ্ঠান করেছেন সেদিন হতে। শেখ মুজিবের চরিত্র হনন প্রক্রিয়ায় নিজামি-খালেদা জোট এবং তাদের অনুগ্রহভোগী বুদ্ধিজীবীরা যে সমস্— যুক্তি প্রায়শই উপস্থাপন করে থাকে- তার মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিই প্রধান:

১- শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। আওয়ামীলীগের

নির্বাচনী ইশতেহারে (১৯৭০ সালের) কোথাও লেখা ছিল না যে পাকিস্—ান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ হবে।

২- রেসকোর্স ময়দানে তার ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। কেন ?

৩- সত্তরের নির্বাচনের পর তিনি এই আশা নিয়ে বসেছিলেন যে তিনিই পাকিস্—ানের পরবর্তী প্রধানমন্্রী হবেন।

৪- পঁচিশে মার্চের কালোরাত্রে তিনি পালিয়ে না গিয়ে পাকিস্—ানী বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করলেন কেন ? পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এই উদাহরণ নেই যে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান ব্যক্তিটি পালিয়ে না গিয়ে শত্রু'র হাতে ধরা দিয়েছে।

৫- পঁচিশে মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, ঐদিন রাত্রে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মেজর জিয়া।

৬- স্বাধীনতার পর তিনি কলকারখানা জাতীয়করণ করে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করেন।

৭- তিনি গণতন্্রকে ধ্বংস করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা তথা বাকশাল কায়েম করেন।

৮- দালাল আইন প্রণয়ন করে তিনি রাজাকার আলবদরদের ঢালাওভাবে ক্ষমা করেন।

৯- বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কুখ্যাত আইনটি তিনিই প্রণয়ন করেন।

১০-সেনা বাহিনীর বিকল্প হিসেবে তিনি রক্ষী বাহিনী নামক একটি প্রাইভেট বাহিনী গঠন করেন এবং জনগণের উপর নির্মম অত্যাচার চালান।

১১-তিনি ভারতের সাথে পঁচিশ বছর মেয়াদী দাসচুক্তি সম্পাদন করেন।

১২-তার আমলেই বাংলাদেশের জন্যে মরণ-ফাঁদ ফরাক্কা বাঁধ চালু হয়।

১৩-তিনি স্বজনপ্রীতি হতে মুক্ত ছিলেন না। তিনি দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা

করেছেন। তাই তিনি গাজী গোলাম মোস্—ফা, শেখ কামাল, শেখ মনি

ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

উপরোক্ত শিকণ্ডগুলির জবাব খোঁজার মানসেই অত্র প্রবন্ধের অবতারণা। নিম্নের অনুচ্ছেদগুলিতে প্রতিটি প্রশ্নকে আলাদা আলাদাভাবে ব্যবেচ্ছেদ করা হলো।

**১। শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে কোথাও লেখা ছিল না যে পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ হবে।**

হ্যাঁ, ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইস্তিফা—হারে কোথাও স্বাধীন বাংলাদেশের কথা সরাসরি লেখা ছিল না একথা সত্য। তবে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত একটি শক্তিশালী স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি বৈধ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সরাসরি স্বাধীনতার কথা লেখা থাকবে - এমন কল্পনা একমাত্র অর্বাচীন ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। এরূপ করলে তার পরিণাম কী হতে পারে সে বোধ জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচয়িতাদের না থাকলেও শেখ মুজিবের ঠিকই ছিল। তাই তিনি বায়াফ্রার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পথ অনুসরণ করেননি কিংবা অনুসরণ করেননি কুর্দিষ্ট—ানের আব্দুল্লাহ ওকালানের পথ। একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে অসময়ে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা করলে তার ফল হবে এক প্রকাণ্ড শূন্য। বিশ্ববাসীর চোখে তিনি একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্ল্যাকশিপ হিসেবে চিহ্নিত হবেন, স্বাধীনতা নামক সোনার হরিণটি চিরদিনই অধরা থেকে যাবে। এ প্রসঙ্গে পাঠককে আমি বায়াফ্রার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা স্মরণ করতে বলি, স্মরণ করতে বলি কুর্দিষ্ট—ানের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। বায়াফ্রা নাইজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের একটি প্রদেশ, তেলসম্পন্ন ভূরপূর। ষাট দশকের শেষার্ধ্বে বায়াফ্রাবাসীরা নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে এক মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়, অনেক রক্ত ঝরে বায়াফ্রার মাটিতে। কিন্তু তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নীট ফলাফল হয়েছে এক প্রকাণ্ড শূন্য। বিশ্ববাসীর চোখে তা কোনদিন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উর্ধ্বে উঠে স্বাধীনতা সংগ্রামের ষ্ট্যাটাস লাভ করতে পারেনি। বিশ্ববাসীর সহানুভূতি বঞ্চিত বায়াফ্রার কৃষ্ণাংগ নেতা ওজুকো এমেকা যুদ্ধে নিহত হন। বায়াফ্রা এখনও নাইজেরিয়ার একটি প্রদেশ হিসেবেই টিকে আছে, অনন্যোপায় হয়ে সেই ষ্ট্যাটাস বায়াফ্রাবাসীরা মেনেও নিয়েছে। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীমূলে অসংখ্য তরুণ তাদের বুকের রক্ত উৎসর্গ করেছিল সেদিন বায়াফ্রায়, কিন্তু তাদের সেই রক্তদান ব্যর্থ হয়ে গেছে। সেই একই ঘটনা ঘটেছে তুরস্কে, আবদুল্লাহ ওকালানের কুর্দিষ্ট—ানে। কুর্দিষ্ট—ানের অবিসংবাদিত নেতা আবদুল্লাহ ওকালান এখন তুরস্কের জেলখানায় বন্দী, কুর্দিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস মাত্র। স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্রগঠনে শিখদের স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীন তামিলভূমির জন্যে এলটিটি'র স্বাধীনতা যুদ্ধ - ইত্যাদি হাজারো উদাহরণ পেশ করা যায় যারা বিশ্ববাসীর চোখে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। ভিন্দ্রানেওয়ালে'র খালিস্তান আন্দোলন কিংবা প্রভাকরণের তামিল এলাম আন্দোলনের বর্তমান হালহকিকত আশা করি সকলের জানা। শেখ মুজিব তার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বলে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে এইরূপ এ্যাডভেঞ্চারিজম তাকে সাময়িকভাবে সস্ত—া পপুলারিটি এনে দিতে পারে, কিন্তু বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা এনে দিতে পারে না। বিশ্ববাসীর চোখে একবার যদি তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত হন, তাহলে বাঙালি জাতির স্বাধীকার লাভ কোনদিন হবে না। তাই পাকিস্তান নামটির আড়ালে সর্বোচ্চ স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবী সম্বলিত ৬ দফা নিয়ে অগ্রসর হন তিনি। ৬ দফা দাবী ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর সাথে স্বাধীনতার এক চুল তফাৎ মাত্র। এই দাবী নিয়ে তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাদেরকে তার দাবীর স্বপক্ষে মটিভেট করেছেন। তার উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন নেমে এসেছে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তার কণ্ঠকে চিরতরে স্তম্ভ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলার মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে ততদিনে চিনে ফেলেছে, পাকিস্তান—ানের দুর্ভেদ্য

কারাগার তাই তাকে আটকে রাখতে পারেনি। জনতার উত্তাল গন-অভ্যুত্থান জনতার নেতাকে ছিনিয়ে এনেছে, সত্তরের নির্বাচনে শতকরা নব্বুই পারসেন্ট ভোট দিয়ে তার প্রতি তাদের অপারিসীম আস্থার প্রমাণ রেখেছে।

সুতরাং যারা বলে যে মুসলিম লীগ এবং জামাতে ইসলামির মতো শেখ মুজিবও বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি, তাই তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ইনক্লুড করেননি- তারা সজ্ঞানে মিথ্যাচার করছেন। সজ্ঞানে বললাম এইজন্যে যে তাদের এই মিথ্যা বক্তব্যের পেছনে উদ্দেশ্য একটাই, মুজিব চরিত্রে কালিমা লেপন করে তার ইমেজকে ধ্বংস করা।

২। রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি কেন ?

৩। সত্তরের নির্বাচনের পর তিনি এই আশা নিয়ে বসেছিলেন যে তিনিই পাকিস্তান—ানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন।

জাতীয়তাবাদী-জামাতিদের উপরোক্ত অনুযোগদ্বয়ের উত্তরে বলতে হয় - সত্তরের নির্বাচনে জনগণ সুস্পষ্টভাবে মুজিবকে পাকিস্তান—ানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রায় প্রদান করে। ইয়াহিয়ার লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পাকিস্তান—ানের অখণ্ডতা মেনে নিয়েই তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। অখণ্ড পাকিস্তান—ানের কাঠামোয় পূর্ববাংলার জনগণ কীভাবে সর্বোচ্চ স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করতে পারে এবং পশ্চিম পাকিস্তান—ানের শোষণের হাত থেকে চিরকালের জন্যে রেহাই পেতে পারে- সেই লক্ষ্যেই তার ৬ দফা দাবী। ৬ দফার প্রতি জনগণের মনোভাব কিরূপ নির্বাচনের মাধ্যমে তা যাচাই করতে তিনি কৌশলে প্রচারণা চালান যে বর্তমান নির্বাচন ৬ দফার স্বপক্ষে গণরায় প্রদানের নির্বাচন। নির্বাচনে জনগণ ৬ দফার পক্ষে সুস্পষ্ট ম্যাডেট প্রদান করে, পূর্বপাকিস্তান—ানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পান তিনি। ভূট্টোর ভাগে জুটে মাত্র ৮৩ টি আসন। দর কষাকষির ছুতোয় তিনি যদি ৬ দফার প্রশ্নে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন, তাহলে তিনি নির্ধাৎ পাকিস্তান—ানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, জনগনের প্রতি বৈষ্ণবানী করে জামা—াদের সাথে আপোষের পথে পা বাড়াননি। পাকিস্তান—ানী শাসকচক্র চেয়েছিল - শেখ মুজিব ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিক। তাহলে তাকে বিপ্লবতাবাদী এবং একটি স্বীকৃত সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার হোতা হিসেবে বিশ্ববাসীর চোখে চিহ্নিত করা সহজ হতো। মুজিব জামা—ার এই ফাঁদে পা দেননি, তিনি একদিকে বলেছেন - ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ..তোমরা যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু’র মোকাবেলা করো, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল’। আরেকদিকে তিনি ইয়াহিয়া-ভূট্টোদের সাথে আপস রফার প্রাণালী— প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুজিব যখন ভাষণ দিচ্ছেন, রেসকোর্সের উপর দিয়ে তখন পাকিস্তান—ানী সামরিক হেলিকপ্টার চক্রর মারছে। ‘আমি এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম’- মুজিবের মুখনিসৃত এইরূপ সরাসরি ঘোষণা আক্রমনোদ্যত পাক-বাহিনীর হাতে গণহত্যার একটি শক্তিশালী অজুহাত তুলে দিত এবং সেই মুহুর্তে রেসকোর্স ময়দানে কেয়ামত নাজেল হয়ে যেতে পারত, হাজার হাজার নরনারীর রক্তে ভেসে যেতে পারত রেসকোর্সের মাটি। এবং সাম্ভাব্য এই গণহত্যার জন্যে পাক-বাহিনীকে কেউ দোষারোপও করতে পারত না, কারণ একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ভাঙার প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্রদ্রোহীতা হিসেবে স্বীকৃত, রাষ্ট্রদ্রোহী জনগণের উপর সামরিক বাহিনীর আক্রমণ সম্মুখ বৈধ। ন্যূনতম সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন কোন রাষ্ট্রনায়ক এমন অর্বাচীন কাজ করতে পারে না। মুজিবও করেননি, তিনি পাক-শাসকদের ফাঁদে পা

দেননি, ৭ই মার্চের ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার ডিক্লারেশন না দিয়ে বলেছিলেন- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, তোমরা যে যেভাবে পার সেভাবেই শত্রু“র মোকাবেলা কর। এখানে লক্ষ্যনীয় যে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটি না দিলেও তিনি যা বলেছিলেন তা আনুষ্ঠানিক ঘোষণার চেয়ে কম ফলপ্রসূ হয়নি। তিনি ‘হুকুম দিবার না পারলেও’ জনগণ ঠিকই তার নির্দেশমত অস্হাতে তুলে নিয়েছে।

৭ই মার্চ মুজিব জাস্—ার ফাঁদে পা দেননি, তবে ২৫শে মার্চ রাতে জাস্—ই মুজিবের ফাঁদে পা দিল। তারা অধৈর্য্য বর্বরতায় নিরস্হ জনগনের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। মুজিব গ্রেফতার হলেন এবং গ্রেফতারের পূর্বে কাংখিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি বেতারযোগে পাঠিয়ে দিলেন। ৭ই মার্চের জনসভায়ও তিনি ঘোষণাটি দিতে পারতেন, কিন্তু সেটি করতে গেলে পাক-বাহিনীর হাতে গণহত্যার একটি বৈধ অজুহাত তুলে দেয়া হতো, বিশ্ববাসীর সহানুভূতি হতে বাঙালি বঞ্চিত হতো, পাকিস্—ানীদের গণহত্যা বৈধ বলে বিবেচিত হতো। ২৫শে মার্চ মুজিব সেই ঘোষণাটিই দিয়েছেন, কিন্তু এবার এবার তার কাজটিকে অবৈধ বি”ছন্নতাবাদ হিসেবে গন্য করার কোন সুযোগ বিশ্ববাসীর ছিল না। পাকিস্—ানীরাও ২৫শে মার্চ সেই কাজটিই করেছে, কিন্তু এবার তাদের কাজটি একটি অন্যায় ও অবৈধ আক্রমণ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরকাল।

বস্তুতঃ ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যাস্— পাকিস্—ানি শাসকদের সাথে মুজিবের আপোষ আলোচনা স্বাধীনতা সংগ্রামেরই একটি ধারাবাহিক ও কৌশলগত প্রক্রিয়ামাত্র। তাই দেখা যায় - মুক্তিযুদ্ধ শুরু“ হওয়ার পরও নেতার প্রতি জনগণের আস্থায় বিন্দুমাত্র ভাটা তো পড়েইনি, আরও বেড়েছে। বন্দী নেতার ইমেজ তাদের মনে আরও হাজারগুন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বন্দী মুজিবই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নিয়মতাস্হিক প্রেসিডেন্ট, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে প্রতিনিয়ত ভেসে আসে তারই বক্তৃকণ্ঠ। ভেসে আসে - “শুন একটি মুজিবের থেকে লক্ষ মুজিবের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রনি”। সেই কণ্ঠ, সেই গান মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রানিত করে, তাদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে।

৪। পঁচিশে মার্চের কালোরাত্রিতে তিনি পালিয়ে না গিয়ে পাকিস্—ানী বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করলেন কেন ? পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এই উদাহরণ নেই যে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান ব্যক্তিটি পালিয়ে না গিয়ে শত্রু“র হাতে ধরা দিয়েছে।

পঁচিশে মার্চ রাত্রিতে মুজিব পালিয়ে যাননি। তিনি তার সকল সহকর্মীকে আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন, কিন্তু নিজে পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণ করেন। পাকবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্—ানের কারাগারে নিয়ে যায়। সামরিক জাস্—া তাকে পূর্ব পাকিস্—ানের কোন কারাগারে রাখার সাহস পায়নি। কারণ উনসত্তরে তারা দেখেছে- এই লোকটিকে ক্যান্টনমেন্টের কারাগারেও আটকে রাখা যায় না, জনগণ সেখান থেকেও তাকে ছিনিয়ে আনে। বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা মুজিবের এই গ্রেফতারবরণকে আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করতে পছন্দ করেন। সারেভার। তিনারা আরও বলে থাকেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে নাকি এরূপ স্বে”ছা-বন্দীত্বের উদাহরণ নাই। বিষয়টি বিশদ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।



বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসেবে তিনি অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন কিংবা ভারত ছাড় আন্দোলন ইত্যাদি গুরু করেন। তার লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা, তবে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে তিনি কখনই সশস্ত্র পথ বেছে নেননি। আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করে ইংরেজদের উপর সম্মিলিত চাপ প্রয়োগ করে তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়ন করাই ছিল মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রাম-কৌশল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজশক্তি যত শক্তিশালীই হোক, জনতার ঐক্যবদ্ধ চাপের কাছে সে পরাভূত হবেই। বৃটিশবিরোধী এই দীর্ঘ সংগ্রামে মহাত্মাকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে, কিন্তু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক “হুঁহু” নেতা গান্ধী আত্মগোপনের চিন্তা—ও করেননি কখনও। নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব এই বিশ্বাসে তার আস্থা ছিল অবিচল। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজকে এদেশ থেকে হটাতে যারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল (যেমন সুভাষ বসু, আশ্বিন্দকর ইত্যাদি), তারা মহাত্মা গান্ধীর পথকে ভ্রান্ত বলে মনে করতেন। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, মহাত্মার প্রদর্শিত পথেই অবশেষে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়, এই ‘নেংটা ফকিরকে’ই ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসী তাই স্বাধীন ভারতের স্থপতি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। গান্ধীজি স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন বলে কেউ কোনদিন বলে নাই যে তিনি ভারতের স্বাধীনতা চাননি। মহাত্মা গান্ধীর আরেক যোগ্য উত্তরসূরি হ’লেন দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা। প্রবাদপ্রতিম এই নেতাও কোনদিন আত্মগোপন করেননি, স্বেচ্ছাবন্দীত্ব বরণ করে বাইশটি বছর শেতাবুদের জেলখানায় অতিবাহিত করেন। বন্দী ম্যান্ডেলার নামে তার সহকর্মীরা স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। পঁচিশে মার্চ রাতে হাইড-আউটে না গিয়ে স্বেচ্ছাবন্দীত্ব বরণ করেছিলেন বলে শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাননি কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন নেতা স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করেছেন এমন উদাহরণ পৃথিবীতে নেই বলে যারা মুজিব চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেন- তারা যে স্বজ্ঞানে মিথ্যাচার করছে পাঠকবর্গের কাছে নিশ্চয়ই তা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্বেচ্ছাবন্দীত্ব আর আত্মসমর্পণ - দুইটি বিপরীতার্থক শব্দ। স্বেচ্ছাবন্দীত্ব সংগ্রামেরই একটা কৌশল, পক্ষান্তরে আত্মসমর্পণ হলো বিজয়ীর হাতে নিজেকে সম্মুখভাবে সঁপে দেয়া, তার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে বিকিয়ে দেয়া। মুজিব আত্মসমর্পণ করেছিলেন, না স্বেচ্ছাবন্দীত্ব গ্রহণ করেছিলেন? যদি আত্মসমর্পণই করে থাকেন তাহলে সুদীর্ঘ নয় মাস কারাগারে আটক রাখার পরও পাকিস্তানী শাসকেরা মুজিবের মুখ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী একটি শব্দও আদায় করতে পরল না কেন? তুরস্কের কুর্দি সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা আব্দুল্লাহ ওকালান, আজীবন স্বাধীন কুর্দি ভূমির জন্যে তুরস্কের সাথে যুদ্ধ করে এসেছেন। সেই ওকালান যখন তুরস্কের হাতে বন্দী হলেন - কিছুদিন পরেই জানা গেল প্রাণভয়ে ভীত নেতা স্বাধীন কুর্দি—ানের দাবী হতে সরে এসেছেন। তিনি কুর্দি গেরিলাদের কাছে অস্ত্র-সমরণের আবেদন জানান। কুর্দি—ানের স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্তমান হাল-হকিকত আশা করি সকলেই অবগত আছেন। পাকিস্তান—ানের জেলখানায় বন্দী থেকেও মুজিব কিন্তু তা করেননি। সেদিন পাকিস্তান—ানকে রক্ষা করার মতো একজনমাত্র ব্যক্তিই সমগ্র পাকিস্তান—ানে অবশিষ্ট ছিল। তিনি আর কেউ নন, মিনওয়ালির জেলখানায় বন্দী শেখ মুজিব, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট। পাকিস্তান—ান সরকার তার জন্যে ফাঁসিকাঠ রেডী করতে পেরেছে কিন্তু বাংলাদেশ-বিরোধী একটি মামুলি বিবৃতিও আদায় করতে পারে

নাই ! প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের একটি বিবৃতি যদি সেদিন রেডিও পাকিস্তান হতে প্রচারিত হতো যে তিনি আপোষ মীমাংসায় পৌঁছেছেন - যুদ্ধ করার আর দরকার নাই - তা'হলে আমাদের এত সাধের মুক্তিযুদ্ধ কোন মার্গে প্রবেশ করত ? মুজিব তা করেননি। প্রহসনের বিচারে যখন তার ফাঁসি সুনিশ্চিত, তখনও তিনি মাথা নোয়াননি। 'শির দেগা নাহি দেগা আমামা' - বিদ্রোহী কবির বাণীকে বাংলা মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম মূর্ত করে তুলেন। এমন একজন নেতার নাম শুনে যাদের গাত্রদাহ হয় - তার স্বেচ্ছাবন্দীত্বকে আত্মসমর্পণ বলে অপপ্রচার চালায়- তারা যে ইয়াহিয়া-টিকাদেবের মানসপুত্র তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এপ্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় আলোচনা না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মুজিব যদি পাকবাহিনীর হাতে ধরা না দিয়ে তার অপরাপর সহকর্মীদের মতো ভারতে চলে যেতেন তা'হলে অবস্থাটা কী দাড়াতো ? তিনি নয়মাস ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করে সেদেশে থাকতেন, ভারতের সক্রিয় সহযোগীতায় ভারতীয় সৈন্যদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হতো, তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশে ফিরতেন। এরূপ অবস্থায় ভারতের কাছে অস্বস্তি হত, ঋণের বাঁধনকে অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সামর্থ্য তার কতটুকু থাকতো ? ইন্দিরা গান্ধীর মতো প্রতাপশালী একজন ব্যক্তিত্বের সামনে স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মাথায় তার মুখে এমন সাহসী প্রশ্ন উঠেছিল কি- 'ম্যাডাম, হোয়েন আর যু গোয়িং টু উইথড্র যুর ফোর্স' ? মাত্র তিন মাসের মাথায় বাংলাদেশের মাটি হতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণ করা সম্ভব হতো কি ? স্বাধীনতার কয়েকমাস পরে ভারতীয় চাপকে অগ্রাহ্য করে লাহোরের ইসলামী সম্মেলনে যোগ দেয়ার একক সিদ্ধান্ত নেয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হতো কি ? সাড়ে-সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত একজন নেতার বিদেশের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের গ্লানির চেয়ে স্বেচ্ছাবন্দীত্বকেই তিনি শ্রেয়তর বলে মনে করেছেন, এজন্যে মৃত্যুভয়কেও তিনি গ্রাহ্য করেননি। পাকিস্তানের জেলখানায় প্রহসনের বিচারে তার জন্যে ফাঁসিকাঠ তৈরী হয়ে গিয়েছিল, ইয়াহিয়া সদর্পে ঘোষণা দিয়েছিল- 'আই উইল কিল দ্যাট বাস্টার্ড'- বেজন্মাটাকে আমি ঝুলিয়েই ছাড়ব। বিশ্ববিরেকের অনতিক্রম্য চাপে ইয়াহিয়া তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। সুতরাং দেখা যাবে যে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক হাইড-আউটে না গিয়ে মুজিবের স্বেচ্ছাবন্দীত্ব বরণ বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বার্থের জন্যে অবশ্যই মঙ্গলজনক ছিল।

৫। পঁচিশে মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, ঐদিন রাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মেজর জিয়া।

এই প্রপজিশনটি জামাতি-জাতীয়তাবাদীদের হাল আমলের রচনা। ২০০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত— তারা প্রচার করে আসছিল যে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক, একাত্তরের ২৭শে মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তিনিই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই স্বাধীনতা-ঘোষণাতত্ত্বের একটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল। যখন প্রশ্ন করা হতো যে জিয়াই যদি স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে থাকেন এবং ২৭শে মার্চ ঘোষণাটি দিয়ে থাকেন, তা'হলে স্বাধীনতা দিবস ২৭শে মার্চ না হয়ে ২৬শে মার্চ হলো কেন ? এই বেয়াড়া প্রশ্নের মুখে অনেক বানু বানু জাতীয়তাবাদীকেও খামুশ হয়ে যেতে দেখা গেছে এবং তর্কযুদ্ধ হতে তড়িঘড়ি পিছু হটতে দেখা গেছে। সুতরাং দুই হাজার এক সালের বিখ্যাত লতিফিয় নির্বাচনে দুইতৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পর তাদের মনে হলো যে অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার। লতিফের আশীর্বাদে তারা সাংবিধানিকভাবে যা খুশী তাই করার ক্ষমতা রাখে, দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির জোরে সংবিধান পরিবর্তন করে তারা যদি ঘোষণা দেয় যে বাংলাদেশের সবাই মহিলা প্রজাতির জীব তা'হলেও কারও বলার কিছু নাই। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে

আর যেন কোন অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি না হতে হয় তা নিরসনকল্পে তারা ২৫শে মার্চের প্রপজিশনটি দাড়া করায়। ঘোষণাটি জিয়া কালুরঘাট কেন্দ্র হতে ২৭শে মার্চ বিকেলে দিয়েছিলেন ২৫শে মার্চ নয়, একথা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ বিষয়ে অতীতে এত বেশী লেখালেখি হয়েছে যে এর উপর আর কিছু আলোচনা করা সময়ের অপচয় মাত্র। তবুও অতি সম্প্রতি খালেদানিজামি জোট কতৃক স্বাধীনতার দলিলপত্র গ্রন্থটি সংশোধনের প্রেক্ষিতে আলোচনাটি পুনরায় লাইম লাইটে চলে এসেছে, সুতরাং এপ্রসঙ্গে কিছু বিষয় পুনরোল্লেখ না করলেই নয়।

একটা জাতির স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ কতৃত্ব উক্ত জাতির কোন সর্বজনস্বীকৃত নেতার হাতেই সংরক্ষিত থাকে, আর কারও হাতে নয়। একান্তরে বাংলাদেশের জাতীয় নেতা ছিলেন- মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান। বয়স ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় ভাসানী অনেক সিনিয়র ছিলেন, শেখ মুজিব এক সময়ে মাওলানার সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করেছেন। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্—বতায় মুজিব তার রাজনৈতিক মুরব্বীকে অতিক্রম করে বাংলাদেশের মানুষের মনে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। **উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশেবিদেশে মুজিবের ইমেজ এতটাই গগনচুম্বি হয়ে দাড়ায় যে মুজিব ও বাংলাদেশ সমার্থক হয়ে যায়।** “এক নেতা এক দেশ - বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ”- উনসত্তর-সত্তরে এটাই ছিল বাঙালি জনগণের সর্বজনপ্রিয় শ্লোগান। সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের দল আওয়ামী লীগ ছাড়া আর সব দল বলতে গেলে পূর্ব বাংলার মাটি হতে নিচিহ্ন হয়ে যায়। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৭টি আসনে বিজয়ী হয়ে মুজিব বাংলাদেশের জনগণের একমাত্র বৈধ নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

সুতরাং পাকিস্—ানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্—ানের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুজিবের সাথেই আলোচনা চালিয়ে যায়। ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত— মুজিবই ছিল পূর্ব বাংলার ডি-ফ্যাক্টো শাসক। পাকিস্—ান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর হাউসে নামকা ওয়াস্— পূর্ব পাকিস্—ানের জন্যে একজন গভর্নর ছিল, মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রিটর হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে ছিল একজন মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রিটর। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল মুজিবের হাতে। তারই নির্দেশে সরকারি অফিস চলত, তারই নির্দেশে কর্মচারিরা বেতন পেত, তারই নির্দেশে ব্যাংকগুলি পরিচালিত হতো। এমনকি সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্টগুলিও পরিচালিত হতো তারই নির্দেশে। বিদেশী পত্রপত্রিকায় এমন রিপোর্টও তখন ছাপা হয়েছে যে ‘ঢাকা শহরে একমাত্র গভর্নর হাউস ও ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া আর কোথাও পাকিস্—ানের পতাকা উড়ছে না, কোথাও পাকিস্—ানের শাসন কার্য্যকরী নাই। পূর্ব পাকিস্—ানের প্রকৃত শাসনক্ষমতা এখন ধানমন্ডীর বত্রিশ নম্বর সড়কে’।

এমন একটা অবস্থায় মুজিবের মুখনিঃসৃত কোন নির্দেশ ছাড়া আর কারও নির্দেশ বাঙালীরা মানবে না, বিশ্ববাসীর কাছে তা বৈধ বলেও বিবেচিত হবে না- একথা পাগলেও বুঝতে পারে। **তাই দেখা যায়- বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের জনসভার কয়েকদিন পর মাওলানা ভাসানী পল্টনে এক জনসভা করেন। উক্ত জনসভায় মাওলানা ভাসানী মুজিবকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার উদাত্ত আহ্বান জানান, বলেন- ‘মুজিব আর দেবী নয়, অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্—ানের স্বাধীনতা ঘোষণা করো’।** অর্থাৎ কাংখিত ঘোষণাটির জন্যে মাওলানাকে তারই এককালের শাগরেদের দিকে চেয়ে থাকতে হ’চ্ছ, তিনি নিজ হতে ঘোষণাটি দিতে পারছেন না। কারন তিনি জানতেন, তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ এখতিয়ার কেবল মুজিবেরই আছে, আর কারও নয়। আর কেউ ঘোষণাটি দিলে শুধু যে বাংলাদেশের মানুষের কাছেই তা



গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হবে তাই নয়, বিশ্ববাসীর কাছেও তার কোন লিগাল স্ট্যান্ডিং থাকবে না। এমতবস্থায় তেত্রিশ বছর পর কেউ যদি দাবী করে বসে যে ২৫শে মার্চ মধ্যরাত পর্যন্ত— যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে একজন নিবেদিতপ্রাণ মেজর হিসেবে কর্মরত ছিলেন, হঠাৎ করেই তার মনে দেশপ্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠে এবং তিনি বেতার মারফৎ একটা ঘোষণা দেয়ার ফলেই জনগণ পাগল হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং দেশটিকে স্বাধীন করে ফেলে— এরূপ দাবীকে দয়িত্বজনীন উদ্ভাবনের প্রলাপ ছাড়া আর কোন বিশেষণে বিভূষিত করা যায় কি ?

২৫শে মার্চ তিনি গ্রোফতার হতে যান—ছন এই সংবাদ মুজিব পূর্বাফ্লেই টের পান এবং তার সহকর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। গ্রোফতারের পূর্বেই তিনি বহুপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি দিয়ে যান। কীভাবে এই ঘোষণাটি ঢাকা হতে বাইরে পাঠানো হয়েছিল, এই প্রেরণপ্রক্রিয়ার সাথে কারা কারা জড়িত ছিল— তার বিস্তারিত বিবরণ গত তেত্রিশ বছর ধরে পত্রপত্রিকায় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত (যেমন তৎকালীন মগবাজারস্থ ভিএইচএফ কন্ট্রোল স্টেশনে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার মেজবাহউদ্দিন, রেডিও টেকনিশিয়ান আব্দুল হামিদ ও ফিরোজ কবির, চট্টগ্রামের সেলিমপুরস্থ ওয়ারলেছ স্টেশনে কর্মরত আব্দুল হাকিম, গোলাম রব্বানী ডাকুয়া, আব্দুল কাদের, মাহফুজ, জুলহাস প্রমুখ কর্মচারি-কর্মকর্তাবৃন্দ। এসম্মেলকে বিস্তারিত বিবরণের জন্যে পড়ুন— দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন চট্টগ্রাম সংবাদ-দাতা জনাব মইনুল আলমের স্মৃতিচারণমূলক জবানবন্দী ‘যে কথা আজও বলিনি’, প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক ইত্তেফাকের স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায়— ১৯৭৩ সালে। স্মর্তব্য— সবেমাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন, স্মৃতি এবং দেশপ্রেম একদম টাটকা- টগবগে। রাজনীতির কলুষতা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি তখনও, বাঙালি জাতির এমন বেদনাদায়ক বিভক্তির কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি সেদিন। লেখক তাই সেদিনকার ঘটনার অত্যন্ত— বিশ্বাসযোগ্য এবং তথ্যনির্ভর বর্ণনা দিতে পেরেছেন তার লেখায়। ২৬ তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধুর মেসেজটি কীভাবে কোষ্টাল স্টেশনের কর্মচারীরা রিসিভ করে, কীভাবে সেটা চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রেরণ করা হয়, কীভাবে তা হ্যান্ডবিলের আকারে রাস্তা-ঘাট বিলি করা হয়, কীভাবে তা ক্যালকাটা শিপিং কন্ট্রোলার কাছে পাঠানো হয়, কীভাবে তা বহির্নৌসরে অবস্থানরত ভারতীয় জাহাজ ভিভি গিরি এবং আমেরিকান জাহাজ এমভি সালভিষ্টা’র কাছে পাঠানো হয়, কীভাবে ভয়েস অব আমেরিকা ঐদিন রাত দশটার খবরে প্রচার করে যে বাঙলাদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, শেখ মুজিব এক অজ্ঞাত স্থান থেকে দেশটির স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন— সমস্ত— ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে লেখাটিতে)। তাদের অগণিত রচনা, স্মৃতিকথা, অডিও ভিডিও সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে বিষয়টি চিরকালের জন্যে প্রমানিত হয়ে গেছে।

বঙ্গবন্ধুর উক্ত ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই চট্টগ্রাম বেতারে কর্মরত বেতারকর্মী আবুল কাশেম সন্দীপ, বেলাল মোহম্মদ, প্রকৌশলী আব্দুশ শাকের, শরফুজ্জামান প্রমুখরা কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র হতে ঘোষণাটি প্রচারের উদ্যোগ নেন এবং ২৬ তারিখ দুপুরের মধ্যেই প্রয়াত আব্দুল হান্নান বাণীটি রেডিওতে পাঠ করেন। একজন আর্মির লোকদ্বারা ঘোষণাটি পাঠ করানো গেলে জনগণ দারুনভাবে উদ্দীপ্ত হবে— এই ধারণায় বেতার কর্মীগণ একজন আর্মি পার্সোনেলের খোঁজ করতে থাকেন এবং ষোলশহরে অবস্থানরত মেজর জিয়ার খোঁজ পান। বেলাল মোহম্মদদের আমন্ত্রণে জিয়া কালুরঘাট আসেন এবং ২৭ তারিখ বিকেল ৭টা ৪০মিনিটে প্রথমবারের মতো তা পাঠ করেন। বেলাল মোহম্মদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের লেখায় এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ জাতীয় সংবাদপত্রে ও অন্যান্য মিডিয়ায় বহুবার প্রচারিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট রথীমহারথীরা যারা মেজর জিয়ার কথিত ঘোষণাটির সাথে প্রতক্ষ্যভাবে জড়িত ছিলেন- এ প্রসঙ্গে অতীতে তারা কী বলেছেন সেইদিকে একবার একটু চোখ বুলানো যাক।

**\*বিএনপি নেতা কর্নেল অলি** তার “আমার সংগ্রাম আমার রাজনীতি” নামক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিখেছেন- “সব কিছু চিন্—া ভাবনা এবং পর্যালোচনার পর আমরা সুপরিকল্পিতভাবে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র দখল করলাম। মেজর জিয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ২৭শে মার্চ বিকেল বেলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। আমি তার পাশেই বসা ছিলাম”।

**\*বিএনপি নেতা মীর শওকত আলী** এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- ‘বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা যেটা নিয়ে সবসময় বিতর্ক চলতে থাকে জেনারেল জিয়া করেছিলেন না আওয়ামী লীগ থেকে করেছে। আমার জানা মতে, সবচাইতে প্রথম বোধ হয় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাইয়ের কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিল। এটা ২৬শে মার্চ ১৯৭১ অপরাহ্ন দু’টার দিকে হতে পারে। কিন্তু চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের প্রেরক যন্ে খুব কম শক্তিসম্পন্ন ছিল, সেহেতু পুরো দেশবাসী সে কণ্ঠ শুনতে পাননি। কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উ’চারিত হয়েছিল, তা’হলে আমি বলব যে হান্নান ভাইয়ের সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ ’৭১ মেজর জিয়ার ঘোষণা প্রচারের পরই স্বাধীনতা যুদ্ধ গুর“ত্বপূর্ণ মোড় নেয়’। (পাঠক, একবার ভাবুন তো ! কিৎনা মজা আ গিয়া ! হান্নান ভাইয়ের ঘোষণার সময় প্রেরক যন্ে র ক্ষমতা কম থাকাতে খুব কম লোকেই তা শুনতে পেল। কিন্তু পরদিন মেজর জিয়া যখন সেই একই যন্ে ভাষণ দিলেন, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্য্য— সব লোকেই তা শুনতে পেল এবং মুক্তিযুদ্ধ গুর“ত্বপূর্ণ মোড় নিল ! এলায় কেমন বুঝতাহেন ?)

**\*নিয়াজির প্রেস সেক্রেটারি সিদ্দিক সালিক** তার উইটনেছ টু সারেভার গ্রন্থে লিখেছেন- ২৫ শে মার্চ রাতে ঢাকায় যখন পাকিস্—ানী বাহিনীর “প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহুর্তে পাকিস্—ান রেডিওর সরকারী তরঙ্গের (ওয়েভলেংথ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হলো আগেই রেকর্ডকৃত। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্—ানকে গণপ্রজাতন্্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন”।

**\*শমশের মবিন চৌধুরি** (জোট সরকারের প্রতাপশালী সচিব) এক সাক্ষাৎকারে বলেন (তারিখ-২০/১০/৭৩, দ্রষ্টব্য- মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, পৃষ্ঠা-৫৯)- “২৬শে মার্চ ভোরে আমরা কালুরঘাটের আর একটু দূরে গিয়ে পৌছলাম। সেখানে আমরা বিশ্রাম নিলাম এবং রিঅর্গানাইজেশন করলাম। ২৬শে মার্চ এভাবে কেটে গেল। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যার সময় মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে গেলেন এবং ভাষণ দিলেন। ২৮শে মার্চ সারাদিন আমি ঐ ভাষণ বেতার কেন্দ্র থেকে পড়ি”।

**\*তৎকালীন শিল্পসচিব একেএম মোশাররফ হোসেন** (জোট সরকারের শিল্পমন্্রী) তার আত্মীয় চট্টগ্রামের এম আর সিদ্দিকীর কাছে ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর একটি মেসেজ পাঠান- “লিবারেট চিটাগাং, টেক অভার এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রসিড ফর কুমিল্লা”। জনাব মোশাররফ হোসেন যে বঙ্গবন্ধুর এই অর্ডারটি পাঠিয়েছিলেন- ১৯৯০ সালে সচিব থাকাকালীন তা তিনি একটি দাপ্তরিক পত্রে স্বীকার করেন (পত্র নং-সচিব/শিল্প-৬৩/৯০ তাং-৭/৩/১৯৯০)।

**\*সাংবাদিক আতাউস সামাদ** ২৫শে মার্চ রাতে গ্রহেতারের পূর্বক্ষণে বঙ্গবন্ধুর সংগে ছিলেন। আতাউস সামাদ বঙ্গবন্ধুকে সাম্ভাব্য আক্রমণের কথা বলাতে তিনি বলেন- আমরাও প্রস্তুত। “আই হ্যাভ গিভেন ইউ ইন্ডেপেন্ডেন্স, নাউ প্রিজার্ব ইট” (আজকের কাগজ- ২২/১/৯৩)।

এবার দেখা যাক **স্বয়ং জিয়াউর রহমান** এ প্রসঙ্গে কী বলে গেছেন। পাঠক- স্মরণ রাখবেন মুজিব-হত্যার পর জিয়া সুদীর্ঘ ৬ বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন এবং একজন সামরিক একনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রে নিরংকুশ ক্ষমতা তার হাতে ছিল। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি যে কেবল হত্যাকাজের মতো অপরাধকেই সাংবিধানিকভাবে বৈধ করে গেছেন তাই নয়, তিনি কলমের এক খোঁচায় সংবিধানের মৌলিক চরিত্রই পাল্টিয়ে দিয়েছিলেন। এহেন ক্ষমতালোভী একজন একনায়ক তার জীবৎকালে স্বাধীনতা ঘোষণাতত্ত্বের বিষয়ে কী বলে গেছেন ?

জিয়াউর রহমান মেজর রফিকদের মতো খুব একটা লেখালেখির ধার ধারতেন বলে মনে হয় না। তার লেখ্য বক্তব্য বড় একটা নাই। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এক অস্থির ও বিস্ফোরণোন্মুক্ত পরিস্থিতিতে জাতির কাভারি হন তিনি, সুতরাং লেখালেখি নিয়ে সময় কাটানোর অবকাশ তার না থাকারই কথা। ছিটেফোটা যা কিছু পাওয়া যায় সেসব সারসংক্ষেপ করলে ঘোষণাতত্ত্ব সম্পর্কে তার বক্তব্য নিম্নরূপ-

\*১৯৭৭ সালের বিজয় দিবসের প্রাক্কালে (১৫ই ডিসেম্বর) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন- “এই পবিত্র মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চের কথা, যেদিন চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আমার বলবার সুযোগ হয়েছিল। সেই একই জাতীয়তাবাদী চেতনা, সাহস ও প্রত্যয় নিয়ে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি”।

\*১৯৭৪ সালের ২৬শে মার্চ অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় তার একটি নিবন্ধ ছাপা হয়- “একটি জাতির জন্ম”। উক্ত নিবন্ধে তিনি বঙ্গবন্ধুকে শুধু **জাতির জনক** বলেই ক্ষ্যান্— হননি, ২৫শে মার্চ রাতে তিনি কোথায় ছিলেন কী করেছিলেন তার পুঁখানুপুঁখ বর্ণনাও দিয়েছেন। নবীন পাঠকদের অবগতির জন্যে উক্ত প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না- “তারপর এলো সেই কালোরাতে। ২৫শে ও ২৬শে মার্চের মধ্যে কালোরাতে। **রাত এগারটায়** আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিল নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে কর্ণেল আনসারির কাছে রিপোর্ট করতে।... আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্যে একজন লোক ছিল। ---আমরা বন্দরের পথে বেরলাম। আধাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এমন সময় সেখানে হাজির হলো মেজর খালেদুজ্জামান চৌধুরি। ক্যাপ্টেন অলি আহম্মদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্—য হাটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে।

এটা ছিল সিদ্ধান্ত— গ্রহণের চূড়ান্ত— সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম- ‘উই রিভোল্ট’- আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহরে যাও। পাকিস্—ানি অফিসারদের গ্রেফতার করো। ..আমি আসছি। ..... ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত— পাকিস্—ানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেঃ কর্ণেল এম.আর.চৌধুরির সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। ..তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম- ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে।.....সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। ....আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সঙ্গ্রামে অবতীর্ণ হতে।.....**তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল।** রক্ত আখরে বাঙালীর হৃদয়ে লেখা একটি

দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনদিন ভুলবে না”।

পাঠক, ভেবে দেখুন - জিয়াউর রহমান তার জবানবন্দীতে ২৫শে মার্চ রাত এগারটা থেকে রাত ২টা ২৫ মিনিট পর্য্যন্ত—  
কোথায় ছিলেন, কি করেছেন, কার কার সঙ্গে কথা বলেছেন সবকিছুর নিখুত বর্ণনা দিয়েছেন। তার কথ্য বা লেখ্য বক্তব্যে  
কোথাও বলেননি বা সামান্যতম ইংগিতও দেননি যে তিনি ঐ রাতে কালুরঘাট গিয়েছিলেন এবং রেডিও মারফৎ ঘোষণাটি  
দিয়েছিলেন। বরং তার এবং তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের কথায় একথা স্পষ্টভাবে প্রমানিত যে কালুরঘাট থেকে ঘোষণাটি তিনি  
পাঠ করেছিলেন ২৭শে মার্চ বিকেলে, ২৫শে মার্চ রাত্রে নয়। তা’হলে নব্য জাতীয়তাবাদীরা তেত্রিশ বছর পরে দুই হাজার  
চার সালে এসে কীভাবে এই আজগুবি থিওরি নিয়ে হাজির হলো যে জিয়া ২৫শে মার্চ রাত্রেই ঘোষণাটি করেছিলেন ! এ  
যেন সেই ধাম্য কৃষকের গল্প- যার গাই সে বলছে বাঁজা, প্রতিবেশীরা বলছে বছর বিয়ানি।

এবার দেখা যাক- ২৭শে মার্চ কালুরঘাট থেকে জিয়াউর রহমান কী ঘোষণা দিয়েছিলেন। নতুন প্রজন্মের অবগতির জন্যে মূল ঘোষণাটি হুবহু তুলে ধরিছি-

[illegible]

এস্থলে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবান দলিলপত্র সংরক্ষণের জন্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রখ্যাত কবি হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়; স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবান দলিলপত্র ও তথ্যাদি সংগ্রহ ও সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দায়িত্ব এই কমিটির উপর ন্যস্ত— করা হয়। ১৫ খন্ডের এই দলিলপত্রের প্রথম ৬টি খন্ড জিয়াউর রহমানের জীবৎকালেই সম্পাদিত

ও পুস্প—কাকারে প্রকাশিত হয়। বাদবাকী ৯টি খন্ড প্রকাশিত হয় জিয়ার মৃত্যুর পর- ১৯৮৬ সালে। তৃতীয় খন্ডে বঙ্গবন্ধু কতৃক স্বাধীনতা ঘোষণা ও মেজর জিয়া কতৃক কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে তা পাঠ করার বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্ত খন্ডটি জিয়ার আমলেই সম্পাদিত হয়েছে, তিনি কখনও এতে তথ্যগত কোন ভুল আছে বলে শনাক্ত করেননি।

এত সমস্যা— তথ্যপ্রমাণ একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ঢাকা থেকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার প্রেক্ষিতেই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে ছাব্বিশে মার্চ প্রয়াত আব্দুল হান্নান এবং ২৭শে মার্চ জিয়াউর রহমান ঘোষণাগুলি দেন। বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত— নির্দেশ না পেয়ে কোন সেনানায়ক স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন না। কারন সেক্ষেত্রে যদি কোন রাজনৈতিক মীমাংসা হয়ে যায় তবে সেনানায়কের কোর্ট মার্শাল অবধারিত।

এর পক্ষকাল পরে ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় যারা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন নয়মাসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারই ছিল বাংলাদেশের আইনানুগ অথরিটি। এই সরকার গঠিত হয় বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৫শে মার্চ প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণার বলে। বিষয়টি পরবর্তীতে বাংলাদেশের সংবিধানেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটিই আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তি, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্মের আইনানুগ অধিকার এই ঘোষণার মধ্যেই নিহিত। এই সত্যকে অস্বীকার করা মানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে অবৈধ বলা, মুক্তিযুদ্ধকে অবৈধ বলা, বাংলাদেশের সংবিধানকে অবৈধ বলা, প্রকারান্তরে বাংলাদেশকেই অবৈধ বলা।

এতগুলি ফ্যাক্টস ও প্রত্যক্ষ সাক্ষীকে বেমালুম অগ্রাহ্য করে বর্তমান জোট সরকার ইতিহাস বিকৃতির এক নির্লজ্জ খেলায় মেতেছে। নব্য জাতীয়তাবাদীরা কেন নতুন করে একটি মীমাংসিত বিষয়কে নিয়ে মিথ্যার বেসাতি করছেন তার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে অকাতরে মিথ্যা বলা জাতীয়তাবাদী তথা জামাতি দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্যে এমনকি জন্মদিন নিয়ে মিথ্যাচার করতেও এদের বাঁধে না।

৬। স্বাধীনতার পর তিনি কলকারখানা জাতীয়করণ করে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করেন।

৭। তিনি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা তথা বাকশাল কায়ম করেন।

এপ্রসঙ্গে বিস্ময়—রিত আলোচনা সময়ের অপচয়মাত্র। কার্ল মার্ক্স নামক এক সমাজবিজ্ঞানী একচেটিয়া পুজিবাদের হাত থেকে জনগণের মুক্তির জন্যে একটি তত্ত্ব দিয়ে যান- বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র ক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়। পরবর্তীতে চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশেও সমাজতন্ত্র কায়ম হয়। ষাট-সত্তরের দশকে আমাদের দেশেও এই মতবাদ দারুন সাড়া জাগিয়েছিল, বিশেষ করে তরুন-তরুনীদের মাঝে। সমাজতন্ত্র তখন শোষিত নির্যাতিত জনগণের মুক্তিসনদ হিসেবে বিবেচিত হতো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুনরা একটি সেকুলার সমাজতন্ত্র ক বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়েই পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মুজিব ব্যক্তিগতভাবে সমাজতন্ত্র ক ছিলেন না, তিনি ছিলেন কেতাবি ভাষায় যার নাম লিবারেল ডেমোক্র্যাট। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভূ-মন্ডলীয় রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার উদার সাহায্য, যুবসমাজের লালিত আকাংক্ষা, সর্বোপরি দরিদ্র জনসাধারণের আশু অর্থনৈতিক মুক্তি - এই সবগুলি ফ্যাক্টর বিবেচনা করে সমাজতন্ত্র ক অর্থনীতিকেই বাংলাদেশের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় ৪টি মূলনীতির একটি



স্বাধীনতার পর আদমজী-ইসলামহানি প্রমুখ অবাঙালি ব্যবসায়ীরা যখন দেশত্যাগ করে, তাদের পরিত্যক্ত কল-কারখানাগুলি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ তখন কী করতো ? জাতীয়করণ না করে বর্তমানকালের রাজনীতিকদের মতো বানরের পিঠা ভাগ করতো ? হ্যাঁ, জাতীয়করণের লক্ষ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। শুধু আমাদের দেশেই নয়, দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই তা এখন ব্যর্থ বলে প্রমানিত হ'ছে। কিন্তু সত্তরের দশকের গোড়ায় যখন সারাবিশ্বে সমাজতন্ত্রের জোয়ার বইছিল, তখন কে বুঝতে পেরেছিল যে এই সিস্টেম একদিন ব্যর্থ বলে প্রমানিত হবে ? একজন নেতা ব্যক্তিস্বার্থে নয়- সমষ্টির স্বার্থে সমস্ত— জাতির আশা-আকাংক্ষাকে ধারণ করে একটি সিদ্ধান্ত— নিল। সেই সিদ্ধান্ত— কাংখিত ফল বয়ে আনতে পারল না বলে তার সমস্ত— অর্জনকে উপেক্ষা করে আজীবনকাল তার নিষ্ফল প্রচেষ্টাকেই দোষারোপ করে যেতে হবে ! এই ব্যর্থতা শুধু মুজিবের একার ? সুকার্ণের ব্যর্থতা নয় ? মোসাদ্দেকের ব্যর্থতা নয় ? আলেন্দ্রের ব্যর্থতা নয় ? লেনিন- মাও সে তুংয়ের ব্যর্থতা নয় ? মার্কস-এন্সলেসের ব্যর্থতা নয় ? বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয়ত্ব কল-কারখানাগুলি পুরোপুরি চালু করতে ৭২ সাল পার হয়ে যায়। সুতরাং মুজিব হাতে সময় পেয়েছিলেন মাত্র আড়াই বছর সময়কাল। তার আড়াই বছরের ব্যর্থতা নিয়ে গত তেত্রিশ বছর উপাখ্যানের পর উপাখ্যান রচনা করা হ'ছে, কিন্তু পঁচাত্তরে তাকে বধ করে যারা পাকিস্তান—নপস্ট্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র (অনেকে কৌতুক করে যাকে 'বাগিস্তান' বলে অভিহিত করে থাকে) কায়েম করেছিল - রাষ্ট্রীয়ত্ব কল-কারখানাগুলি নিয়ে সুদীর্ঘ্য তিন দশককাল তারা কী করেছে ? তাকে খুন করার তিরিশ বছর পরে এখনও কেন রাষ্ট্রীয়ত্ব কলকারখানা টিকে আছে ?

আর বাকশাল ? এসম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ কিছু লিখতে হলে লেখকের সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। সমাজবিজ্ঞানের উপর আমার জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়, তবু তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ যেহেতু খুব নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল তাই একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে সে সম্পর্কে কিছু মতামত দেয়া বোধ হয় দোষের হবে না। মুজিব বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পঁচাত্তরে, বোধ হয় মৃত্যুর মাস তিন-চারেক আগে। তিনি চরিত্রগতভাবে বহুদলীয় গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুসারি ছিলেন। তাই দেখা যায়, সংবিধানে সমাজতন্ত্রের বিধান থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশে ওয়েস্ট-মিনিষ্টার ষ্টাইলের বহুদলীয় গনতন্ত্রই চালু রাখেন যা ছিল সমাজতন্ত্রবর্ণিত ‘সর্বহারার একনায়কতন্ত্র’র (উরপঃধঃডঃৎয়রঢ় ডভ ঙব চৎডঃবঃধঃরঃবঃ) সরাসরি বিরোধী। একই সাথে সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র-জিনিসটি বোধ হয় কাঠালের আমসত্ত্বের সমগোত্রীয় কোনকিছু। গ্রাম্য প্রবচনে দুই নৌকায় পা রাখার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বলা হয়। ৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত—মুজিব বোধ হয় দুই নৌকায় পা রেখেই চলতে চেয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি গণতন্ত্র। আমেরিকার সাহায্য-সহযোগীতার জন্যেও আকুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি, সদ্যস্বাধীন দেশটির লাখ লাখ ক্ষুধার্ত মুখে অন্যসংস্থানের জন্যে এ ছাড়া আর কীইবা করার ছিল তার ? পাকিস্তান ভাঙার অপরাধে এবং সমাজতন্ত্র কয়েমের প্রকাশ্য অঙ্গীকারের কারণে সিআইএ’র গোপন খাতায় আলেন্দ্রে-ক্যাস্ট্রোর পাশাপাশি তার নামটিও যে লেখা হয়ে গেছে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। তবে আমেরিকান আনুকূল্য তার ভাগ্যে জুটেনি। দেশের সামগ্রিক অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হতে থাকে। বামপন্থী মিত্র এবং তরুন প্রজন্মের চাপে তিনি অবশেষে তার দুই নৌকায় পা রাখার নীতি পরিত্যাগ করে সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা করার ফাইনাল সিদ্ধান্ত—নে। এই যাত্রার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে তিনি সব রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে একটি জাতীয় দল গঠন করেন যার নাম বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ-

সংক্ষেপে বাকশাল। শুরু হয় তার “অধনতান্ধি ক বিকাশের পথে” যাত্রা। সমাজতন্ত্র কামী নেতাকর্মীরা তার এই বিলম্ব সিদ্ধান্তে—র ওয়েলকাম জানায়, দলে দলে বাকশালে যোগদান করতে থাকে (উল্লেখ্য- বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের ফাউন্ডিং ফাদার মেজর জিয়াউর রহমান মুজিবের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে সহস্রো বাকশালে যোগদান করেছিলেন, প্রাথমিক বাকশালীদের মধ্যে তিনিও অন্যতম)। বর্তমানে যেসমস—মহারথী বাকশাল বাকশাল বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন, তাদের অনেকেই সেদিন বাকশালে যোগ দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। বাকশাল সিস্টেমকে গ্রহন করতে পারেননি এবং মুজিবের সামনেই সেদিন বাকশালের সমালোচনা করেছিলেন - এমন হাতে গোনা দু'চার জন লোকের মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন- বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরি, কবি শামসুর রহমান এবং সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরি। গাফফার চৌধুরি “ক্লান্তি— আমার ক্ষমা করো প্রভু” শিরোনামে একটি বিখ্যাত কলামের মাধ্যমে বাকশালকে প্রত্যাখ্যান করেন বলে জানা যায়।

বাকশাল সিস্টেম ভাল কি মন্দ সে রায় দেয়ার কোন উপায় নাই, কারন সিস্টেমটি পরীক্ষিত হওয়ার সময় পায়নি। জনের সাথে সাথে অঙ্কুরেই তাকে বিনষ্ট করা হয়েছে। তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত এই যে সিস্টেমটি চালু করতে মুজিব অনেক বিলম্ব করে ফেলেছিলেন। স্বাধীনতার পর পরই যদি তিনি এই প্রথাটি চালু করতেন, দু নৌকায় পা রাখার ভুল না করতেন, তা'হলে সিস্টেমটি হয়তো ভাল ফলই বয়ে আনতে পারত। কারন স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যুবসমাজের মনমানসিকতা দেশপ্রেমে ভরপুর ছিল, তাদের স্বপ্নে ছিল অসাম্প্রদায়িক সমাজতান্ধি ক শোষণহীন বাংলাদেশের ছবি, তাদের মধ্যে তেমন উল্লেখ্যযোগ্য অনৈক্য ছিল না, তেমন কোন চাহিদাও ছিল না। তিনবছর পর যখন তিনি পরিস্থিতি উপলব্ধি করেন, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। স্বাধীনতার শত্রু“রা ইতিমধ্যেই অনেক সুসংগঠিত হয়ে গেছে, আন্—জাতিক মুর“বীদের কৃপায় তারা প্রথম সুযোগেই আঘাত হানতে পেরেছে এবং মুজিব তথা বাকশালকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে।

৮। দালাল আইন প্রণয়ন করে তিনি রাজাকার আলবদরদের ঢালাওভাবে ক্ষমা করেন।

জাতীয়তাবাদীরা মুজিবকতৃক যুদ্ধপরাধদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সমালোচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমিও শেখ মুজিবের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করি না। তবে সমকালীন বৈশ্বিক রাজনীতি বিবেচনায় আনলে তার এই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত—টির জন্যে বিবেকবান মানুষের মনে তার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে অনুকম্পারই জন্ম দেবে। শেখ মুজিব এমন একটি দেশের রাজা হয়েছিলেন যা নয় মাসের যুদ্ধের কবলে পড়ে ধবংসপ্রায়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য, ব্রিজ-কালভার্ট ধবংসপ্রায়, মিল-কারখানা অচল, যুদ্ধের অবধারিত ফলস্বরূপ কোটি কোটি ছিন্নমূল আদমসন্—ানের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ঘাড়ের উপর। তর“নদের হাতে অন্, চোখে তাড়াতাড়ি ভাগ্যবদলের অদম্য আকাংখা। বহির্বানিজ্য, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান অন্—ত্ববিহীন। সর্বোপরি মাথার উপর সাড়ে-সাতকোটি ক্ষুধার্ত মুখ। গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মতো এই সময় তেলের দাম হঠাৎ করেই কয়েক গুন বেড়ে যায়। এই ঘোর দুঃসময়ে যেটার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল - তা হলো আমেরিকার মতো ধনী দেশগুলির উদার ও শর্তবিহীন সাহায্য। কিন্তু পরিস্থিতি ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টো। ভূট্টো-ইয়াহিয়ার মতো নিরস্ত্র-কিসিঞ্জাররাও শেখ মুজিব নামটি শুনলে আঁতকে উঠতেন। সমাজতন্ত্র নামক যুগুর ভয়ে যুক্তরাষ্ট্র তখন তটস্থ। শেখ মুজিব বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়ম করার স্বপ্ন দেখছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই নামটি ওয়াশিংটনের একনম্বর শত্রু“ বলে বিবেচিত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? জনগণ যত বেশী খাদ্যাভাবে হাহাকার করবে তত বেশী মুজিব বিরোধী হবে, তাদের মন তত বেশী সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রতি বিষিয়ে উঠবে। খাদ্যকে অন্ হিসেবে ব্যবহার করার এমন সুযোগ আর হয় না। স্বাধীনতার পর পরই চিটাগাংগামী গম বোঝাই কয়েকটি আমেরিকান জাহাজকে

ডাইভার্ট করে করাচী নিয়ে যাওয়া মুজিবের বিরুদ্ধে খাদ্য-অসুস্থ প্রয়োগের সুস্পষ্ট প্রমাণ। আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ধনী মুসলিম দেশগুলির মন জয় করার জন্যে মুজিব মরিয়া হয়ে উঠলেন। তার এই প্রচেষ্টার প্রমাণ মেলে ভারতের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও লাহোরের ইসলামি সম্মেলনে যোগ দেয়া। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম মোড়লদের মন জয় করার জন্যেই যে তিনি সাধারণ ক্ষমাঘোষণার মতো একটি তিক্ত সিদ্ধান্ত— নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে মুজিব-প্রণীত কোলাবরেটর এ্যাক্টে সেইসব ক্রিমিনালদের ক্ষমা করা হয় নাই যাদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কুকর্মের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। অর্থাৎ এই আইন বলবৎ হওয়ার পরও গোলাম আজম, নিজামি, মুজাহিদি বা মাওলানা মান্নানদের মতো চিহ্নিত যুদ্ধপরাধীদের রেহাই পাওয়ার কোন পথ ছিল না। তার এই আইনের সবচেয়ে বেশী বেনিফিসিয়ারি হয়েছিল গ্রামেগঞ্জে সেইসব হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যারা মাসে মাসে সামান্য পয়সা অর্জনের লোভে দলে দলে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করার কোন সুযোগও তিনি দেননি। সুতরাং দালাল আইন বলবৎ হওয়া সত্ত্বেও তার আমলে যুদ্ধপরাধী গোষ্ঠী মাথা তুলে দাড়ানোর কোন সুযোগ পায় নাই। শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করার পর তার হত্যাকারী গোষ্ঠীই যুদ্ধপরাধীদেরকে বাংলাদেশে ঢালাওভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। যারা যুগের পর যুগ ধরে দালাল-তোষণ নীতি অনুসরণ করে শাহ আজিজ-নিজামি-মুজাহিদি-মান্নানদের মতো চিহ্নিত দালালদের রাষ্ট্রীয় মসনদে পাকাপোক্ত করেছে, তারাই অহর্নিশ দালাল আইনের বিরুদ্ধে উচ্চকিত। এই আচরণের পেছনে কোন হিডেন এজেন্ডা কার্যকরী আছে, তা বিচারের ভার আমি পাঠকসমাজের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

৯- বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কুখ্যাত আইনটি তিনিই প্রণয়ন করেন।

১০-সেনা বাহিনীর বিকল্প হিসেবে তিনি রক্ষী বাহিনী নামক একটি থাইভেট

বাহিনী গঠন করেন এবং জনগণের উপর নির্মম অত্যাচার চালান।

উপরের পয়েন্ট দু'টি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মাত্র, সুতরাং একইসঙ্গে পয়েন্ট দু'টির উপর আলোচনা করা যায়। যে কারণে মুজিব রক্ষী বাহিনী দিয়ে জনগণের উপর নির্মম অত্যাচার চালান বলে অভিযোগ করা হয়, সেই একই কারণে তিনি বিশেষ ক্ষমতা আইন বা ইমারজেন্সী পাওয়ার এ্যাক্টও প্রণয়ন করেন।

কোন প্রেক্ষিতে মুজিব বিশেষ ক্ষমতা আইনটি প্রণয়ন করেছিলেন? দেশের অবস্থা তখন কেমন ছিল? স্বাধীনতার পরে জনগৃহনকারী নবীন পাঠকদের অবগতির জন্যে বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার আবশ্যকতা রয়েছে। একটি ধ্বংসপ্রায় কপর্দকশূন্য দেউলিয়া রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করার পর তাকে পুনর্গঠন করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সহজ কাজ ছিল না, বলতে গেলে কাজটি এতই কঠিন ছিল যে কেউ কেউ একে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার চেয়েও কঠিনতর বলে অভিহিত করেছেন। এই সুকঠিন কাজের জন্যে প্রয়োজন ছিল সকল দেশপ্রেমিক দলের ঐক্য ও সম্মিলিত উদ্যোগ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার বছর খানেকের মধ্যেই জাতির ভেতর অনৈক্য ও বিভেদের সূর ধ্বনিত হয়ে উঠে। নবগঠিত জাসদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান নিয়ে হাজির হয় এবং 'গণবাহিনী' নামক একটি গুপ্ত সংগঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লব করে সমাজতন্ত্র কায়েমের শপথ নেয়। সিরাজ শিকদারের পূর্ববাঙলা সর্বহারা পার্টি নক্সালবাড়ী ষ্টাইলের বিপ্লব সাধনের মানসে সাধারণ মানুষকে শ্রেণীশত্রু আখ্যা দিয়ে তাদের গলা কেটে দেশজুড়ে এক অকল্পনীয় সংঘাতের রাজত্ব কায়েম করে (সর্বহারারা এখনও দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সক্রিয় আছে, যদিও তাদের কর্মকাণ্ড তিয়াত্তর-পাঁচাত্তরের মতো এতটা ব্যাপক নয়)। গণবাহিনী ও সর্বহারাদের সংঘাত তিয়াত্তর-চুয়াত্তরে কোন পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল এতদিন পরে তা ধারণায় আনাও কষ্টকর। নবীন পাঠকদের অবগতির জন্যে শুধু এইটুকু বলাই

যথেষ্ট হবে যে তিয়ান্তর সালের জুন মাস থেকে পাঁচাত্তরের জুন মাস পর্য্যন্ত— ২ বছরে কয়েকশত থানা ও পুলিশ ফাড়ি গণবাহিনী ও সর্বহারাদের দ্বারা আক্রান্ত— হয় এবং এর মধ্যে রক্ষিত যাবতীয় অসশস্ত্র লুণ্ঠিত হয়। সশস্ত্রসীদের দৌরাভ্র এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তারা এমনকি বিডিআর এবং সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালাতেও কসুর করেনি। (উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়- ৭৪ সালের ১লা আগষ্ট চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা থানা সশস্ত্রসীদের দ্বারা আক্রান্ত— হলে ২জন বিডিআর জওয়ান নিহত হয়। ঐ একই বছর ১১ই অক্টোবর সশস্ত্রসীরা মাদারিপুরের সাহেবরামপুর সেনাক্যাম্পে আক্রমণ করে ৯ জনকে হত্যা করে)। এইসব বিপ্লবী নামধারী সশস্ত্র সশস্ত্রসীরা শুধু পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা অগনিত ব্যাংক, তহসিল অফিস ইত্যাদি অর্থকরী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা চালিয়েছে ও লুট করেছে, পাটের গুদাম ও বিভিন্ন মিল-ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগিয়েছে, এমনকি বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যকে পর্য্যন্ত— খুন করেছে। শ্রেনীশত্রু“ আখ্যা দিয়ে কতো সাধারণ মানুষকে যে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া দুষ্কর। পাঠকের অবগতির জন্যে আমি ৭৩ সালে শুধুমাত্র আগষ্ট মাসে সংঘটিত সশস্ত্রসী কার্যকলাপের একটি তথ্যচিত্র পেশ করছি--

১লা	আগষ্ট-	ঘিওর	থানার	জাবরা	ফাড়ি	আক্রান্ত—	ও	অসশস্ত্র	লুট
২রা	আগষ্ট-	কুষ্টিয়ার মীরপুর	থানার আমলা	ফাড়ি	আক্রান্ত—	ও	অসশস্ত্র	লুট	৫ই
আগষ্ট-	ঢাকার শিবপুর	থানা	আক্রান্ত—	ও	অসশস্ত্র	লুট			৭ই
আগষ্ট-	বরিশালের বাবুগঞ্জ	থানার চাঁদপাশা	ফাড়ি	আক্রান্ত—	ও	অসশস্ত্র	লুট		৯ই
আগষ্ট-	কুষ্টিয়ার মীরপুর	থানার আটগ্রাম	ফাড়ি	আক্রান্ত—	ও	অসশস্ত্র	লুট		১০ই
আগষ্ট-	ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ	থানার উচাখিলা	ফাড়ি	আক্রান্ত—	ও	অসশস্ত্র	লুট		১১ই
আগষ্ট-	সাতকানিয়া	থানার চুনটি	ফাড়ি	আক্রান্ত—	ও	অসশস্ত্র	লুট		১৩ই
আগষ্ট-	পটুয়াখালির পাথরঘাটা	থানার জ্ঞানপাড়া	রেঞ্জ অফিস	হতে	অসশস্ত্র	লুট। ঐ একই দিন বরিশালের স্বরূপকাঠি			
থানার ইন্দারহাট	ফাড়ি	আক্রান্ত—	ও	অসশস্ত্র	লুট	এবং ঢাকার কাপাশিয়া থানা	আক্রান্ত—	ও	অসশস্ত্র
লুট। ঐ একই									
দিন	হ্যাভ	থেনেড	চার্জ	করে	চট্টগ্রামে	ব্যাংক	লুট।		
১৫ই	আগষ্ট-	পার্বত্য	চট্টগ্রামের	লামা	থানার	ফাড়ি	লুট।		
২০শে	আগষ্ট-	সশস্ত্রসীদের	সাথে	সেনাবাহিনীর	তিন	ঘন্টা	গুলি	বিনিময়।	
২৩শে	আগষ্ট-	হোমনা	থানার	চন্দনপুর	ফাড়ির	অসশস্ত্র	লুট।		
২৫শে	আগষ্ট-	বৈদ্যেরবাজার	থানার	আনন্দবাজার	হাট	হতে ৯ জন সাধারণ লোক	অপহৃত, পরের দিন ৭ জনের লাশ		
উদ্ধার।									

উপরের তথ্যগুলি ৭৩-৭৫ সালের বাংলাদেশের সামগ্রিক চালচিত্র পাঠকের চোখে স্পষ্ট করে তুলবে বলে আশা করি। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় এই জাতীয় ঘটনাই ছিল প্রাত্যহিক সংবাদ-শিরোনাম, মানুষকে ভীত সশস্ত্র— করে তুলতে ও তাদের মনে নিরাপত্তাহীনতার সঞ্চার করাই ছিল এইসব সশস্ত্রসী কর্মকাণ্ডের অন্যতম লক্ষ্য। এই সর্বগ্রাসী সশস্ত্রসীদের মুখে পুলিশ বাহিনী যে শুধু অসহায় ছিল তাই নয়, তারাই ছিল এই সব সশস্ত্রসীদের প্রধানতম টার্গেট। কিছুদিন আগে বর্তমান জোট সরকার সশস্ত্রস দমনকল্পে অপারেশন ক্লিনহাট নাম দিয়ে সেনা বাহিনী নামিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর হাতে জনা-পঞ্চাশেকের মতো সশস্ত্রসী মারা গিয়েছিল। ৭৩-৭৫ এর সশস্ত্রস ছিল এই সশস্ত্রসের চেয়েও হাজারগুন

বেশী ব্যাপক ও মারাত্মক। কারন বর্তমান কালের সন্তানসীদের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ নাই, এরা নেহায়েতই অর্ডিনারি ক্রিমিনাল মাত্র। পক্ষান্ধ—রে ৭৩-৭৫ এর সন্তানসীরা একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছিল। নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি বৈধ সরকারকে উৎখাত করে তাদের নিজস্ব মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সুতরাং তাদের দমনের জন্যে বঙ্গবন্ধু প্যারামিলিটারি বাহিনী নামিয়ে কি ভুল করেছিলেন পাঠক? অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় সেনাবাহিনী ক্রিমিনালদের সাথে যে কঠোর আচরণ করেছে, রক্ষীবাহিনী সেইরূপ কঠোর আচরণ করেছিল কি? আমার তো মনে হয়, **বঙ্গবন্ধু ভুল যদি কিছু করে থাকেন তা রক্ষী বাহিনীর ডেপুয়মেন্ট নয়, তার ভুল হয়েছিল রক্ষী বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার জন্যে নির্দেশ না দেয়া।** তার এই ক্ষমাশীলতা ও সদয় আচরণ পরবর্তীতে শুধু তার এবং তার পরিবারের জন্যেই যে বিপর্যয় ডেকে এনেছে তা নয়, সমগ্র জাতির জন্যে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্যেও বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তার উত্তরসুরি জিয়া এই ভুল করেননি, তিনি কঠোরহস্তে— গোপন বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের নিশ্চিহ্ন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি, এমনকি প্রাণরক্ষাকারী কর্ণেল তাহেরকেও নয়। তাই দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু রক্ষীবাহিনী দিয়ে যা পারেননি, জিয়া অল্পদিনেই তা পেরেছিলেন। অনায়াসেই জাসদের গণবাহিনীকে ইনএ্যাক্টিভ করে ফেলেছিলেন, বিপ্লবীরা বিপ্লবটিপুব বাদ দিয়ে ডরের চোটে ইঁদুরের গর্তে গিয়ে মুখ লুকিয়েছিল। তাদের স্বপ্নের সমাজ-বিপ্লব চাপে উঠেছিল।

বৃটিশদের দ্বারা প্রণীত মাক্কাতা আমলের আইন দিয়ে সেই অস্থির সময়কে সামাল দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই তাকে ইমার্জেন্সি পাওয়ার এ্যাক্ট প্রণয়ন করতে হয়েছিল। যুগের দাবী মেটাতে ইমার্জেন্সি পাওয়ার এ্যাক্ট প্রণয়ন করে বঙ্গবন্ধু ভুল করেছিলেন কিনা—সে বিচারের ভার আমি পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম। আরও একটি বিষয়ে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বঙ্গবন্ধুর পরে তিরিশ বছর কেটে গেছে, শাসকের পর শাসক এসেছে, গিয়েছে। কালো আইন প্রণয়নের জন্যে সবাই বঙ্গবন্ধুর কড়া সমালোচনা করেছে, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে কেউ আইনটি বাতিল করেনি। নিজেদের স্বার্থরক্ষায় নির্বিচারে আইনটি প্রয়োগ করেছে আর একটি কালো আইন প্রণয়নের জন্যে জনসভায় বঙ্গবন্ধুর চৌদ্দগুণ্টা উদ্ধার করেছে! সত্যিই বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস!

### ১১-মুজিব ভারতের সাথে পঁচিশ বছর মেয়াদী দাসচুক্তি সম্মাদন করেন।

এই অভিযোগটি নিতান্ধ—ই ভিত্তিহীন একটি অভিযোগ। একটি বন্ধুপ্রতিম দেশ, যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অকৃত্রিম সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছে, প্রবাসী বাঙলাদেশ সরকারের নয়মাসব্যাপী আবাসনস্থল ছিল যে দেশটি, দেড় কোটি অসহায় ছিন্নমূল শরণার্থীকে নয়মাস ধরে আহার বাসস্থান যুগিয়েছে যে দেশটি, আমাদের মুক্তির জন্যে যে দেশের হাজার হাজার সৈনিক তাদের বুকের রক্ত ঢেলেছে— সেই দেশের সাথে সম্মাদিত একটি শান্ধি— ও মৈত্রী চুক্তিকে যারা দাসচুক্তি বলে অভিহিত করে— তাদের প্রতিহিংসামূলক কথার জবাবের আদৌ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবুও বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদেরকে একটু স্ব’ছ ধারণা দেওয়ার প্রয়োজনে কিছু কথা না বললেই নয়। এ প্রসংগে প্রথমেই আমি একাত্তর সালে সম্মাদিত ভারত-রাশিয়া শান্ধি— ও মৈত্রী চুক্তিটির কথা উল্লেখ করব। যদি কেউ ভারত-রাশিয়া শান্ধি—চুক্তিটি পড়ে দেখেন, তাহলে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে **বঙ্গবন্ধু কতক সম্মাদিত ভারত-বাঙলাদেশ শান্ধি—চুক্তি ভারত-রাশিয়া শান্ধি—চুক্তির কার্বণ কপি ছাড়া আর কিছু নয়।** ভারত-রাশিয়া শান্ধি—চুক্তিকে কোন ভারতবাসী দাসচুক্তি বলে অভিহিত করেছে, এমন উদাহরণ নাই। স্বাভাবিক শান্ধি—পূর্ণ অবস্থায় এই চুক্তির কোন কার্যকারীতা নাই, চুক্তিভুক্ত দেশগুলির কোন একটি যদি বহিঃশত্রু’র দ্বারা আক্রান্ধ— হয়, তখনই কেবল এই



চুক্তির এনফোর্সমেন্টের প্রশ্ন আসে। তাই দেখা যায়, শান্টি—চুক্তি সম্প্রদানের ২৫ বছরের মধ্যেও এই এই চুক্তি কখনও কার্যকরী হয় নাই। এমনকি পাঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু যখন নির্মমভাবে নিহত হন, তখন বঙ্গবন্ধুর একান্ত— গুনমুগ্ধ ও শুভাকাংখী মহাপ্রতাপশালী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন থাকতেও কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাননি। বস্তুতঃ বর্হিশত্রুর আক্রমণ ব্যতিরেকে একদেশের আভ্যন্তরীণ—রীণ ব্যাপারে অন্যদেশের হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ এই চুক্তিতে ছিল না। যদি বিন্দুমাত্র সুযোগও থাকত, ভারত নিশ্চিতভাবে হস্তক্ষেপ করত। তারপরও জামাতি জাতীয়তাবাদীরা যুগের পর যুগ এই চুক্তিকে দাসচুক্তি অভিহিত করে বঙ্গবন্ধুর মুণ্ডুপাত করেছে, অথচ ক্ষমতায় গিয়ে কখনও এই চুক্তির বিরুদ্ধে টু শব্দটি করে নাই, চুক্তিটি বাতিল করার সামান্যতম উদ্যোগও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নাই। এর বিরুদ্ধে তাদের বিষোদগার ছিল জনগনের চোখে ধুলো দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার কৌশল মাত্র। বঙ্গবন্ধুকন্য শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় গিয়ে তবেই চুক্তিটি আর নবায়ন করেননি। **ধারণা করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে ছিয়ানবুইতে যদি জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতায় যেতো, শান্টি—চুক্তিটি আবার নবায়ন হতো এবং আজতক বহাল থাকত।** ক্ষমতার বাইরে থেকে ভারত বিরোধীতার সন্তোষ—শোধান আর ক্ষমতায় গিয়ে ভারতের নির্লজ্জ তোষণ—জাতীয়তাবাদীদের বুলিতে এর অধিক কোন মূলধন আছে এমন প্রশ্ন কেউ দিতে পারবেন না।

প্রশ্ন হিসেবে পাঠককে ২০০১ সালের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত— সংঘর্ষের কথা স্মরণ করতে অনুরোধ করছি। শেখ হাসিনার শাসনামলের একেবারে শেষ পর্যায়ে জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে তৎকালীন বিডিআর চিফ (নামটা ঠিক মনে নাই, ফজলুর রহমান না কি যেন) হঠাৎ করেই ভারতের সীমান্ত—রক্ষী বাহিনীর সাথে এক মারাত্মক সংঘর্ষের সূত্রপাত করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সংঘর্ষের বিষয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ অনবহিত ছিলেন। ভারতের টিভি চ্যানেলগুলি হতে দেখানো হতে থাকে— কীভাবে বীর গ্রামবাসীদের সহায়তায় বিডিআর জওয়ানরা ভারতীয় সীমান্ত—রক্ষী বাহিনীকে মেরে বাঁশে বুলিয়ে মৃত গরুর মতো নিয়ে যাচ্ছে। এই নৃশংস ছবি দেখে ভারতের জনগণের মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল জানি না, তবে ভারত-বাংলাদেশ যে একটা নিশ্চিত সীমান্ত— যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে— পৌঁছে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে টেলিফোনে দুঃখ প্রকাশ করে কোনমতে যুদ্ধটা এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন সেদিন। এরপর বিডিআর চীফকে প্রত্যাহার করেন তিনি। এই প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শিবির বাঘের মতো গর্জে উঠেছিল, ভারতের দালাল শেখ হাসিনাকে তীব্র সমালোচনার তোড়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল। সেই সমালোচনার তাৎক্ষণিক ফলাফল কিছু দেখা না গেলেও কয়েকমাস পরের নির্বাচনে তা যে জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে ভাল প্রভাব ফেলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তারপর ? জনগণ ভেবেছিল, জোটশক্তি ক্ষমতায় গেলে ফজলুর রহমান শুধু যে তার আগের পদ ফেরৎ পাবেন তাই নয়, ভারতের বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামের ইনাম স্বরূপ নির্ঘাৎ বীরোত্তম টিরোত্তম পেয়ে যাবেন। কিন্তু বাস্তব—বে তা হয় নাই। ইনাম দূরে থাক, ক্ষমতায় যাওয়ার পর বেচারার চাকুরিটাও টিকে নাই। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে প্রথমেই ভারতের সাথে সীমান্ত—বিরোধ সংক্রান্ত— বৈঠক করার উদ্যোগ নেয়। ভারত সাফ জানিয়ে দেয়, ফজলুর রহমানকে অপসারণ না করা হলে বাংলাদেশের সাথে কোন প্রকার বৈঠকে বসতে রাজী নয় তারা। কী আর করা, জনসভায় দাড়িয়ে ভারতবিরোধী বিপ্লবী ভাষণ দেয়া সহজ, মুখে মুখে রাজা উজির মারা কোন ব্যাপার না। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে হলে ভারতীয় দাদাদের চাপ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আর যারই হোক বিএনপি'র নাই। সুতরাং মহাশক্তিধর জোটশক্তি অশ্লানবদনে ফজলুর রহমানের চাকুরিটি খেয়ে নিল ! শেখ হাসিনা ভারতের দালাল বলেই তাকে বিডিআর চীফ থেকে অপসারণ করেছিলেন, চাকুরিচ্যুত

করেননি। কিন্তু জোটশক্তি ? এক্ষেত্রে চাকুরি থেকে আউট ! পতিত বীর এখন খবরের কাগজে কলাম লেখে জোটের বিরুদ্ধে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে হালকা হেঁছন। এটাই হেঁছ জাতীয়তাবাদীদের ভারতবিরোধীতার লেটেষ্ট নমুনা। শেখ হাসিনা ছিয়ানবুইতে ক্ষমতায় এসে ভারত-বাংলাদেশ শান্তি—চুক্তিটি নবায়ন করেনি, ভবিষ্যতে এর বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে আর মাঠ গরম করা যাবে না, বড়োই আফসোস। এই ধরনের শত্রুতা মি করা কি হাসিনার উচিত হয়েছে ? এপ্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের ভারতবিরোধীতার আরও দু একটি সাম্প্রতিকতম নমুনা স্মরণ করা যায়। পার্বত চট্টগ্রাম শান্তি—চুক্তির বিরুদ্ধে ম্যাডাম লং-মার্চ করেছিলেন, বলেছিলেন তার জন্মস্থান ফেনী পর্য্যন্ত— ভারতের দখলে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে শেখ হাসিনা। ক্ষমতায় যাওয়ার পর এ সম্মিলকে আর কোন বাতচিত শোনা যাইছে না, পাহাড়ীদের সাথে সম্মিলিত চুক্তিটি বাতিল ঘোষণা করে ফেনী শহরকে রক্ষা করার কোন লক্ষণও দেখা যাইছে না। এই হলো জাতীয়তাবাদীদের ভারত-বিরোধীতার নমুনা !

১২-মুজিবের আমলে বাংলাদেশের জন্যে মরণ-ফাঁদ ফরাক্ক বাঁধ চালু হয়।

বিষয়টিকে গোড়া থেকে বিশ্লেষণ করা দরকার।

পাকিস্তান—

১। ন সৃষ্টির পর দেখা গেল যে পাকিস্তান—ানের উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলির উৎসমুখ ভারতে। পশ্চিম পাকিস্তান—ানের সিন্ধু নদ এবং এর শাখানদী-উপনদীগুলির (শতদ্রু, ইরাবতী, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা) পানি ভাগাভাগি নিয়ে ভারত-পাকিস্তান—ানের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। অবশেষে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের মধ্যে এক স্থায়ী পানি-বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় “ইন্ডাস বেসিন প্রজেক্ট” নামে যা বিখ্যাত হয়ে আছে। কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বাস—বায়িত এই চুক্তির সিংহভাগ পয়সা ব্যয়িত হয় পূর্ব পাকিস্তান—ানের পাট-বেচা পয়সা হতে। এই চুক্তি বাস—বায়নের পর পানি বিষয়ে ভারত পাকিস্তান—ানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আজ পর্য্যন্ত—ও হয়নি।

পূর্ব পাকিস্তান—ানের নদীগুলির উৎসমুখও সব ভারতে। পশ্চিম পাকিস্তান—ানের মতো পূর্ব পাকিস্তান—ানের নদীগুলি নিয়েও ভারতের সাথে চুক্তি হোক এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তান—ানবাসীর যৌক্তিক অধিকার। তবে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে পানির স্বল্পতা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান—ানের তেমন কোন সমস্যা ছিল না, তাই রাজনীতিবিদগণ এ নিয়ে খুব একটা জল ঘোলা করেননি। কিন্তু ষাটের দশকে ভারত যখন ফরাক্ক বাঁধ নির্মাণ করে পদ্মা নদীর পানি পশ্চিম বঙ্গের হুগলি নদী দিয়ে ডাইভার্ট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তখন বিষয়টি পূর্ব পাকিস্তান—ানের স্বার্থের উপর হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। ইন্ডাস বেসিন প্রজেক্টের মতো পূর্ব পাকিস্তান—ানের জন্যেও ভারতের সাথে একটা পানিবন্টন চুক্তি হোক- পূর্ব পাকিস্তান—ানের জনগণের এটাই ছিল প্রাণের দাবী। মাওলানা ভাষানী এবং শেখ মুজিব ফরাক্ক বাঁধ বিষয়ে ভারতের সাথে আলোচনা করে পূর্ব পাকিস্তান—ানবাসীর জীবন-মরণ সমস্যার একটা ন্যায্যসঙ্গত সমাধানের জন্যে পাকিস্তান—ানের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর জোর চাপ দেন। পাকিস্তান—ানে তখন লৌহমানব বলে খ্যাত জেনারেল আইয়ুব ক্ষমতায় আসীন। পশ্চিম পাকিস্তান—ানের শাসকগোষ্ঠী বরাবরের মতো এবিষয়েও যথার্থীতি নিশ্চুপ থাকে, ভারত অপ্রতিহতগতিতে ফরাক্ক বাঁধ নির্মাণ কাজ চালিয়ে যায়। একান্তরে যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, ফরাক্ক প্রজেক্ট তখন প্রায় শেষ হওয়ার পথে। একান্তরে বাংলাদেশ জনের সাথে সাথে ফরাক্ক বাঁধও চালু হয়।

নবীন রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিব পানিবন্টন নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন এবং দাবী করেন যে বাংলাদেশকে কোন অবস্থাতেই পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মুজিব-ইন্দিরা বৈঠকে এই

সিদ্ধান্ত— হয় যে বাঁধ চালুর আগে বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবে যে পরিমান পানি পেত, বাঁধ চালুর পরও সেই একই পরিমান পানি (৪৪ হাজার কিউসেক) পেতেই থাকবে, বাংলাদেশের হিস্যায় হাত দেয়া হবে না। মুজিব হত্যার আগ পর্যন্ত— ফারাক্কা বাঁধের কোন প্রভাব বাংলাদেশে অনুভূত হয়নি। সুতরাং যারা মুজিবকে ফারাক্কার জন্যে দায়ী করে, তারা যে অজ্ঞতাগ্রসূত তা করে সেটা ভাবা ভুল হবে। তারা ভাল করেই জানে যে সমস্যাটির জন্যে দায়ী পূর্ব পাকিস্তান—  
 ানের স্বার্থের প্রতি পাকিস্তান—ানের কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাহীন ঔদাসীন্য। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে একটি প্রজেক্ট অলরেডী চালু হয়ে গেছে, মুজিবের পক্ষে তা বন্ধ করে দেয়া কীভাবে সম্ভব ছিল ? তার পক্ষে যা সম্ভব ছিল- তা তিনি সঠিকভাবেই করেছিলেন, বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা ঠিকই আদায় করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে মুজিবের মৃত্যুর পর পানি বন্টন নিয়ে দুই দুইবার ভারতের সাথে চুক্তি হয়- একবার জেনারেল জিয়ার আমলে এবং একবার শেখ হাসিনার আমলে। জিয়া মুজিবের আমলের ৪৪ হাজার কিউসেকের পরিবর্তে মাত্র ২৭ হাজার কিউসেক পানি নিয়েই তুষ্ট হয়ে ফিরে আসেন। ৯৭ সালে সম্প্রদিত শেখ হাসিনা ভারতের সাথে পানি নিয়ে ৩০ বছর মেয়াদি আরেকটি চুক্তি করতে সমর্থ হন। সেই চুক্তিতে তিনি প্রাপ্য পানির পরিমান ২৭ হাজার থেকে ৩৩ হাজার কিউসেকে উন্নীত করতে সমর্থ হন। এখন পাঠকই বিচার করে দেখুক- ভারতের আসল সেবাদাস কারা- জাতীয়তাবাদীরা না আওয়ামী বাকশালীরা ! সর্বশেষে একটি কথা না বললেই নয়। ভারত সরকার ইদানীং আরেকটি উ”চাভিলাশী প্রকল্প হাতে নিয়েছে- ইষ্টার্ন রিভার লিঙ্কিং প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের লক্ষ্য হলো ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা-বরাক নদীর উপর বাঁধ দিয়ে এদের পানি দক্ষিণ ভারতে ডাইভার্ট করা। এই প্রজেক্ট কার্যকরী হলে বাংলাদেশ আক্ষরিক অর্থেই মর”ভূমি হয়ে যাবে। জনগণ আশা করে- দেশপ্রেমিক জোট সরকার অবিলম্বে ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ করে এই সর্বনাশা প্রজেক্ট বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**১৩-মুজিব স্বজনপ্রীতি হতে মুক্ত ছিলেন না। তিনি দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাই তিনি গাজী গোলাম মোস্—ফা, শেখ মনি, শেখ কামাল প্রমুখের বির”দ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি।**

অভিযোগ দুইটি- স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি। প্রথম  
 অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে আত্মীয়স্বজনের প্রতি দুর্বলতা মানুষের সহজাত ধর্ম। ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, এমনকি মহামানবরাও এথেকে মুক্ত ছিলেন না। এস্থলে দু’চারটা উদাহরণ কোট করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা। তিনি তার এক ভাগ্নেকে (ভাগ্নের নামটা স্মরণ করতে পারছি না, দুঃখিত) এমন এক সরকারি পদে নিয়োগ দেন যে পদের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ভাগ্নেটির ছিল না। এ নিয়ে পার্লামেন্টে দার”ন সমালোচনার মুখোমুখী হয়েছিলেন শেরে বাংলা। অবশেষে সমালোচকদের প্রশ্নের জবাবে বাংলার বাঘ গর্জন করে উঠলেন- “ইট ইজ হিজ বেষ্ট কোয়ালিফিকেশন দ্যাট হি ইজ দ্য নেফিও অব শেরে বাংলা একে. ফজলুল হক”।  
 বাঘের গর্জনে সমালোচকরা স্তিমিত হন।  
 সে যাক্ গে, স্বজনপ্রীতি একটা সহনীয় পর্যায়ে থাকলে তাতে দোষের কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। বেনজীর ভুট্টোর স্বামী আসিফ জারদারি যদি একেবারে ‘মিষ্টার টেন পারসেন্ট’ হয়ে না বসতেন তা’হলে তাকে নিয়ে হয়তো এতটা হৈ চৈ হতো না। ম্যাডামের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানকে অনেকে ক্রাউন প্রিন্স বলে অভিহিত করে থাকেন। হাওয়া ভবনই নাকি বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল নিয়ামক, হাওয়া ভবনের শেয়ার ঠিকমত না হলে নাকি আজকাল কিছুই করা যায় না। এসব শুধুই রটনা, না এসব রটনার মূলে সত্যতা কিছু আছে একমাত্র ভবিষ্যতই তা বলতে পারে।

তবে একটা কথা নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে আমাদের দেশটা গুজবের কারখানা, এদেশের আকাশে বাতাসে প্রতিমুহুর্তে নানাপ্রকার গুজব গজায়।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি স্বজনপ্রীতির যে অভিযোগ ঢালাওভাবে আরোপ করা হয়ে থাকে- তার কতটুকু সত্য আর কতটুকু অন্ধ বিদ্বেষপ্রসূত গুজব তা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে তিনি স্বজনপ্রীতি করার কতটুকু সুযোগই বা পেয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে যা দৃষ্টান্ত— হয়ে থাকবে? শেখ মনির প্রতি তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন- এ কথা সত্য। একজন রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে শেখ মনি ছিলেন অতুলনীয়, যোগ্যতার বলেই তিনি আওয়ামী লীগের যুব ফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে ছিলেন। শেখ মনির প্রতি বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতা সবটাই ছিল রাজনৈতিক কারনপ্রসূত, সেখানে অর্থনৈতিক কোন ফ্যাক্টর একেবারেই ছিল না। স্বজনপ্রীতি করে মুজিব শেখ মনিকে কোটি কোটি ডলার কামানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন এমন অভিযোগ কেউ করে না। তবে **শেখ মনির প্রতি দুর্বলতার বড় কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে**। শেখ মনির পরামর্শেই নাকি তাজউদ্দিনের মতো নিবেদিতপ্রাণ নেতাকে আউট করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন গ্রুপ আউট হওয়ার পরই বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে থাকা মুশতাক-চক্র শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং তার পরিণতিতে পনেরই আগস্টের শোকবহ ঘটনা ঘটতে পেরেছিল। তাজউদ্দিনকে অপসারণ করে বঙ্গবন্ধু তার কোমড়বন্ধ হতে শানিত তরবারটিই অপসারণ করেছিলেন সেদিন।

গাজী গোলাম মোস্—ফা ও শেখ কামাল সংক্রান্ত— অভিযোগগুলি পুরোপুরি বানোয়াট। গাজী সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় যে রেডক্রসের সভাপতি থাকাকালীন তিনি কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেন। এমন প্রচারণাও করা হয়েছে যে চুয়াত্তরে দুর্ভিক্ষের সময় যখন দেশের অগণিত মানুষ না খেয়ে মরছে, গাজী মোস্—ফার ঘোড়ার আস্—বলে নাকি ঘোড়াকে অটেল গম খাওয়ানো হবে! এই প্রচারণা তৎকালে দারুন বাজার পেয়েছিল। একদিকে এক টুকরা কাপড়ের অভাবে ছেড়া জাল পরিহিতা হতভাগী বাসন্—ীর ছবি, আরেকদিকে গাজী গোলাম মোস্—ফাদের ভাগ্যবান ঘোড়াকতক টন টন গম-ভক্ষনের রোমাঞ্চকর কাহিনী। এনায়েতুল্লাহ খান, আল-মাহমুদ আর হক-কথাওয়ালাদের কলম ঝলসে উঠল। কোন্টা সত্য আর কোন্টা মিথ্যা প্রপাগান্ডা সে বিচার পরে। তাত্ত্বিকভাবে এইসব প্রচারণা জনমনে নিদারুণ প্রভাব ফেলে এবং মুজিবের গগনচুম্বি ইমেজকে ধরাশায়ী করতে সমর্থ হয়। ঈঙ্গ-মার্কিন প্রপাগান্ডা যন্ যে কতটা শক্তিশালী, ইরাক যুদ্ধের সময় সিএনএন বিবিসি'র কল্যাণে আজ আমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সে মুহুর্তে একজন মানুষকে রাক্ষস বানিয়ে ফেলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- **“তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর হৃদে গানে”**। পশ্চিমা প্রপাগান্ডা মেশিনগুলি সংবাদে মেক-আপ লাগিয়ে একজন মানুষকে দেবতা থেকে দানবের পর্যায়ে টেনে নামাতে পারে।

মুজিবের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা ঘটেছিল, মিথ্যা প্রচারণায় তিনি দেবতা থেকে দানবে পরিণত হয়েছিলেন। সাড়া জাগানো রংপুরের সেই বাসন্—ী আজও বেঁচে আছে, কত টাকার বিনিময়ে সে ছেড়া জাল পরে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছিল সেকথাও বেরিয়ে এসেছে আজ। গাজী গোলাম মোস্—ফার চিত্রও কিছুমাত্র ভিন্নতর নয়। পরবর্তীতে তদন্— করে দেখা গেছে, গাজীর কোন ঘোড়াই ছিল না, সুতরাং আস্—বল থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। আর রেডক্রসের টাকা লোপাট? বঙ্গবন্ধু হত্যার পর গাজীকে জেলে পোরা হয়। কিন্তু অনেক তদন্—র পরও তার একাউন্টে কোটি টাকা দুরে থাক, হাজার টাকাও মিলেনি। বিষয়টি ছিল বঙ্গবন্ধুর চরিত্রকে মসীলিপ্ত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার বিরোধী তথা মার্কিন প্রপাগান্ডা মেশিনে তৈরী একটি চমৎকার ফিকশন মাত্র।



শেখ কামালের প্রতি অভিযোগ, সে নাকি রাইফেল হাতে বাংলাদেশ ব্যাংকে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। সুযোগ পেলেই জাতীয়তাবাদীরা এখনও এই গল্প করে সুখ পায়, এমনকি জাতীয় সংসদের পবিত্র ফ্লোরে দাড়িয়েও। প্রকৃতপক্ষে গল্পটি এতই হাস্যকর যে সাধারণজ্ঞানসম্পন্ন যে কেউ এর অস্ম—সারস্ব্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। **প্রথমতঃ**—শেখ কামাল ছিল শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠ ছেলে। টাকার জন্যে বাংলাদেশের মুকুটহীন সম্রাটের ছেলেকে থ্রি নট থ্রি রাইফেল হাতে ব্যাংক ডাকাতি করতে হবে ! কেন ? শেখ কামাল একটু ইঙ্গিত দিলে এমনিতেই তো লাখ লাখ টাকা নিয়ে অনেক রথী মহারথী তার পায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ত তখন। এখন যেমন তারেক রহমান বা আলহাজ্জ মোসাদ্দেক আলীর একটু কৃপালাভের জন্যে কতো কোটিপতি, ওডিপতি এবং আরও কতো নানা বর্ণের পতিরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে, একটু ঈশারা করলেই টাকার বস—তাদের পায়ে গড়াগড়ি যাবে। টাকার জন্যে তারেক রহমান বা মোসাদ্দেক আলীকে বন্দুক কাঁধে ডাকাতি করতে বেরতে হবে ! শেখ কামালের ক্ষেত্রেও অবস্থার ইতরবিশেষ হওয়ার কথা নয়। তখন দেশে হয়তো এত কোটিপতির ছড়াছড়ি ছিল না, তবে লাখপতি যে অটেল ছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। শেখ মুজিবের ছেলের টাকার দরকার হলে তাকে বন্দুক ঘাড়ে ব্যাংক ডাকাতিতে যেতে হবে—একথা কেবল ষ্টুপিডরাই বিশ্বাস করতে পারে।

**দ্বিতীয়তঃ**—বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টটি নির্মিত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে, ১৯ ইঞ্চি কামান দিয়েও তা ভাঙা যায় না বলে বিশেষজ্ঞেরা বলে থাকেন। শেখ কামাল একটি রাইফেল দিয়েই সেই ভল্ট ভেঙে ফেললেন এবং টাকাপয়সা সব লুট করলেন ! এমন একটি অসম্ভব কাজ সাধন করার জন্যে তাকে তিরস্কার না করে বরং পুরস্কৃত করা উচিত, তার নাম গিনেজ বুক অব রেকর্ডে লিখে রাখা দরকার। সাথে কি আর মাইকেল বলেছিলেন—**“বানরে সঙ্গীত গায় শিলা ভাসে জলে, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়”**। বাংলাদেশের মতো সব সম্ভবের দেশে হয়তো সত্যি সত্যি জলে পাথর ভাসে, রাইফেলের গুলিতে ব্যাংকের ভল্ট ফেটে চৌচির হয়ে যায়, ছেড়া গেম্ভী আর ভাঙা ব্রিফকেসের ভেতর হতে কোটি কোটি ডলার প্রবাহিত হয়ে মানুষকে অবাক করে দেয়।

এবার আসা যাক শেখ মুজিবের দুর্নীতি প্রসঙ্গে। মানুষ দুর্নীতি করে অর্থলোভে, কেউ বা যশ কামানোর আশায়। মুজিব জীবিতাবস্থায়ই সাড়ে সাতকোটি বাঙালির মনের মনিকোঠায় স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছিলেন খুব কম সংখ্যক নেতার ভাগ্যেই যা ঘটে। সুতরাং পার্থিব ধনসম্পদ কুক্ষিগত করার প্রয়োজন তার ছিল না। হত্যার পর ঘাতকচক্র তার চরিত্র হননের জন্যে অনেক মিথ্যা কাহিনী সাজিয়েছে, কিন্তু কোনটাই জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। তাকে হত্যার পর তার বাসভবন হতে প্রাপ্ত জিনিষের যে সিজার লিষ্ট করা হয়, তার মধ্যে দুইজন সদ্য-বিবাহিত নারীর উপটোকন হিসেবে প্রাপ্ত কিছু সোনার গয়না ছাড়া মূল্যবান আর কিছুই ছিল না। তার বা পরিবারবর্গের কারও নামে কোথাও কোন গোপন ব্যাংক একাউন্ট আবিষ্কার করা যায় নাই যেখানে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমান অর্থ মগজুদ ছিল। তার জীবিত দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তার মৃত্যুর পর কপর্দকশূন্য অবস্থায় ভারতে আশ্রয় নেয়, জীবিকা নির্বাহের জন্যে মুজিব তাদের জন্যে সুইস ব্যাংকের ভল্টে একটি কানা আঁধলাও রেখে যাননি—বড়োই আফশোস। ভারত সরকার নেহায়েত দয়া করে ওয়াজেদ মিয়াকে একটি চাকুরি দেয়, তাই দিয়ে দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত—কোনমতে কায়ক্লেশে সংসার চালায় বঙ্গবন্ধু কন্যা। এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন বাংলাদেশের এই ভাগ্যহীন মহানায়ক।

**শেষ কথা:** শেখ মুজিব কোন মহামানব ছিলেন না, আমাদের মতোই তার দোষ ছিল, ভুল ছিল। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী যেটা ছিল—তা হলো সিংহের মতো বিশাল একটি হৃদয়। অগাধ দেশপ্রেমে অনুক্ষণ পরিপূর্ণ হয়ে থাকত যে হৃদয়টি। সেই হৃদয় দিয়ে তিনি বাঙলাকে ভালবেসেছিলেন, বাঙলার কৃষককে ভালবেসেছিলেন, বাঙলার শ্রমিককে ভালবেসেছিলেন, বাঙলার সাধারণ মানুষকে ভালবেসেছিলেন। এবং সেই সব মৌন মুক অবহেলিত মুখে একটু হাসি ফুটতে, তাদের



অধিকারের জন্যে কথা বলতে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। সে সংগ্রামে তিনি কখনও ক্লান্ত— হননি, কোন আপোষ করেননি, ফাঁসির দড়িকেও পরোয়া করেননি। মুজিবের স্বদেশপ্রেমের আয়নায় বাঙালি তার নিজকে দেখতে পেয়েছে, একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ভূ-খন্ড পেয়েছে, একটি মানচিত্র পেয়েছে, একটি স্বাধীন আইডেন্টি পেয়েছে, একটি সবুজরঙা পাশপোর্ট পেয়েছে যা নিয়ে সে সুমের “কুমের” তেও বিচরণ করতে পারে এখন। বিনিময়ে বাঙালিও তাকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনটি সানন্দে ছেড়ে দিয়েছে। একজন ভারতবাসীর মনে গান্ধীর যে আসন, একজন ইন্দোনেশিয়ানের মনে শোয়েকার্নোর যে আসন, একজন তুরস্কবাসীর মনে কামাল আতা-তুর্কের যে আসন, এবজন বাঙালির মনে শেখ মুজিবেরও সেই আসন। কারও সাধ্য কি যে সেই আসন হতে তাকে বিন্দুমাত্র সরায়? যতদিন বাঙালি আছে, বাংলাদেশ আছে, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা আছে, ততদিন মুজিব নামটিও আছে। সাধে কি আর কবি বলেছেন- যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরি যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

খালেদা-নিজামি জোট আবার নোংড়া খেলায় মেতেছে, মুজিবকে একজন মেজরের সমপর্যায় টেনে নামানোর হাস্যকর প্রচেষ্টায় মেতেছে। যে চেয়ারে বসে তারা এইসব অপকীর্তি করছে, সেই চেয়ারের জন্যেও তারা মুজিবের কাছেই ঋণী। এই সত্য যে তারা জানে না তা নয়। তবুও তারা করছে, কারন-- “ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে, ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পরে”।

সুতরাং একাজ তারা করবেই।

মেজবাহউদ্দিন জওহের

তারিখ- ৭ই আগষ্ট, ২০০৪ সাল।

E-mail: [mezbahmezbah@hotmail.com](mailto:mezbahmezbah@hotmail.com)